

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ।

(শ্রীম-কথিত ।)

প্রথম ভাগ ।

“তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্যাণপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

মাঘ, ১৩১৯।

Published by

PRAVAS CHANDRA GUPTA,

13-2 GOOROO PROSAD CHOWDRY'S LANE,

Calcutta.

All Rights Reserved.

মূল্য বাঁধান ১।০ এক টাকা চারি আনা । Copyrighted by the Author.

The Right of Translation, Reproduction, Adaptation and all other rights are reserved.

Swami Vivekananda to 'M'.

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkrishna in the right point.

Few alas, few understand him !!

•ANTPORE.

২৬ আষ. ১৮৮৭.

NARENDRA NATH.

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

October 1897, c/o Lala Hansaraj, Rawalpindi.—

“Dear M., *C'est bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo, that is the way.

“Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form **. Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈমাহি সদ্ কাল বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir). That is the time.” **Vivekananda**

Dehra Dun, 24th November, 1897.—“My dear M., many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namasker, yours in the Lord, Vivekananda.

P. S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the west.”

Vivekananda

• Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Premananda. The Swamiji and many of his fellow disciples were at this time, staying as guests at the house of Swami Premananda.

শ্রীশ্রীঠাকুরদেব
শ্রীপাদপদ্মভরসা ।
পূজা ও নিবেদন ।

—:~:—

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্
ভক্তানুকম্পাপ্রতিবিম্বরূপং বৈ ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥

মা,

ঠাকুরের জন্ম মহোৎসব উপস্থিত । এ আনন্দের দিনে আমাদের
এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন
নৈবেদ্য ।

১লা ফাল্গুন,

১৩০৮ ।

}

আশীর্ব্বাদাকাজক্ষী,

আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ ।

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা ।

ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন ।
ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানা ভাবে
থাকিতেন । সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরাম-
কৃষ্ণকথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল । সেই চিত্রগুলি সূচিপত্রে উল্লিখিত
হইয়াছে । অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া ঠাকুরের আনন্দ ; ও বিদ্যাসাগর, কেশব, বঙ্কিম
ইত্যাদি অনেক ভক্ত ও পণ্ডিতের সহিত দেখা—এ সমস্ত কথা পর পর ধরে
যথাসাধ্য বলিবার ইচ্ছা রহিল ইতি । কলিকাতা ১লা ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল ।

মা,

আজ আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন ; ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়া ।
আজ আবার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল । ইতিমধ্যে মা তোমার আশী-
র্ব্বাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগের তৃতীয় সংস্করণ, ও দ্বিতীয়
ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল । মা তুমি জগতের মা ; কৃপা

করিয়া আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরকে চিন্তা করিয়া দেশে দেশে ও
সর্বকালে, তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ হয় ও
শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩১১।

বুধবার, জন্মমহোৎসব।

একান্ত শরণাগত,

মা তোমার প্রণত সন্তানগণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। ইহাতে বোধ
হইতেছে পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে
বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না।
তিনি জগতের আদর্শ, — তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি
দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। ইতি

কলিকাতা, কার্তিক সংক্রান্তি, ১৩১৪।

মা,

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব আবার উপস্থিত। আজ আবার শ্রীশ্রীকথামৃতের
প্রথম সংস্করণ হইল। ইহার ইংরাজী অনুবাদও হইয়াছে। আপনার আশীর্বাদে
এখন সমস্ত ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার অমৃতময়ী কথা প্রচার
হইতেছে। মা, আপনি কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করুন, যেন, ঠাকুর শ্রীশ্রীরাম-
কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া লোকের শান্তি, আনন্দ ও অস্ত্রে ঈশ্বর লাভ হয়।
ফাল্গুন, শুক্লাষীতীয়া, ১৩১৬।

শ্রীজন্মমহোৎসব।

গ্রন্থকারস্তু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চারি ভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীম—বা ‘মাষ্টার’
বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা
নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য
ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন
কাহিনী Diaryতে লিপিবদ্ধ ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন
সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থ ভাগ ।

খণ্ড			
প্রথম	(১-১১-৮৩)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি সঙ্গে	১
দ্বিতীয়	(২৫-২-৮৩)	ঐ রাখাল, রাম, নিত্যগোপালাদি সঙ্গে	১২
তৃতীয়	(৭-৪-৮৩)	বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টারাদি সঙ্গে	১৬
চতুর্থ	(২-৫-৮৩)	নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাষ্টার সঙ্গে	১৯
পঞ্চম	(৮-৬-৮৩)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম প্রভৃতি সঙ্গে	২৩
ষষ্ঠ	(১৮-৬-৮৩)	পেনিটির মহোৎসবে রাখাল, রাম, মাষ্টারাদি সঙ্গে	২৫
সপ্তম	(১৫-১৯।১২।৮৩)	দক্ষিণেশ্বরে রাখালাদি অন্তরঙ্গ সঙ্গে	৩১
অষ্টম	(২৩-১২-৮৩)	দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে	৪৫
নবম	(২৯-৩১।১২।৮৩)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	৫৭
দশম	(২-২-৮৪)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে	৬৯
একাদশ	(২৪-২-৮৪)	ঐ রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে	৮০
দ্বাদশ	(২৩-৩-৮৪)	ঐ রাখাল, রাম, নিত্য, অধর প্রভৃতি সঙ্গে	৮৫
ত্রয়োদশ	(২৫-৫-৮৪)	ঐ জন্মোৎসবে বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্রাদি সঙ্গে	৯৮
চতুর্দশ	(২০-৬-৮৪)	ঐ সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মাষ্টারাদি সঙ্গে	১০৭
পঞ্চদশ	(৩-৭-৮৪)	বলরামমন্দিরে মাষ্টার, শশধর প্রভৃতি সঙ্গে	১১৩
ষোড়শ	(৩-৮-৮৪)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, অধর, শিবপুর ভক্তগণ সঙ্গে	১
সপ্তদশ	(৬-৯-৮৪)	অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে	১৬
অষ্টাদশ	(৭-৯-৮৪)	দক্ষিণেশ্বরে রাম, বাবুরাম, নিরঞ্জনাদি সঙ্গে	১৪৩
উনবিংশ	(১৪-৯-৮৪)	ঐ নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	১৫৯
বিংশ	(১৬-৯-৮৪)	ঐ মহেন্দ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে	১৭৪
একবিংশ	(২-১০-৮৪)	ঐ লাটু, মাষ্টার, মুখ্যো প্রভৃতি সঙ্গে	১৯৬
দ্বাবিংশ	(৫-১০-৮৪)	ঐ বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি সঙ্গে	২১৫
ত্রয়োবিংশ	(১৩, ১৪-৭-৮৫)	বলরামমন্দিরে নরেন্দ্র, নারাণাদি সঙ্গে	২৩২
চতুর্বিংশ	(৯-৮-৮৫)	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টারাদি সঙ্গে	২৫৭
পঞ্চবিংশ	(২৭, ২৮-৮-৮৫)	ঐ রাখাল, পণ্ডিত শ্রামাপদ প্রভৃতি সঙ্গে	২৬৮
ষড়বিংশ	(৩১।৮, ১, ২।৯।৮৫)	ঐ জন্মাষ্টমী দিবসে নরেন্দ্রাদি সঙ্গে	২৭৩
সপ্তবিংশ	(২৩-১০-৮৫)	শ্রামপুকুরে ডাক্তার, নরেন্দ্র, গিরীশাদি সঙ্গে	২৮৩
অষ্টবিংশ	(২৪-১০-২৫)	ঐ ঐ ঐ সঙ্গে	২৯৩
উনত্রিংশ	(২৭-১০-৮৫)	ঐ ঐ প্রভৃতি সঙ্গে	২৯৭
ত্রিংশ	(৩১-১০-৮৫)	ঐ মিশ্র, হরিবল্লভ, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে	৩০১
একত্রিংশ	(২৩-১২-৮৫)	কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে	৩০৭
দ্বাত্রিংশ	(১১-৩-৮৬)	ঐ ঐ	৩১২
ত্রয়োত্রিংশ	(১৭।৪।৮৬)	ঐ ঐ	৩১৫
বরাহনগর মঠ	(২১, ২২-১০-৮৭)	নরেন্দ্রাদির ৬শিবরাত্রি ব্রত	৩২৩
দৈনিক চরিত্র বা শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা ।		শতাধিক চিত্র ।	৩২৭-৫২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথম ভাগ—সূচীপত্র ।

শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত ।

সদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থা ।—ঈশ্বরাবেশ নিজের ভিতর আর একজন,—মুখে দিব্য জ্যোতিঃ ২৬৬ ; দাস্য অবস্থা—২৭১ ; গলিত হস্ত, ৬১ ; পঞ্চবটীতে ক্রন্দন ২৪০, ২৭১ ।

ঈশ্বরীয়া রূপদর্শন ।—সিংহবাহিনীতে দেবীর আবির্ভাব, ৯৯ ; বিষ্ণুপুরে লালবাঁধে মুগ্ধাঙ্গী দর্শন ৯৯ ; ১১ বৎসর বয়সে ঈশ্বরী দর্শন ২৬৫ ; হালদার পুকুর ও পানাঠেলা ১৮৪ ; দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বেশামধ্যে মাকে দর্শন ২৭১ ; চিংসমুদ্র,—কোটি ব্রহ্মাও তাতে উৎপত্তি ও তাতেই লয় দর্শন ১৯৭ ।

প্রথমাবস্থার ভক্তগণ ।

অখুরবাবু—৮রাধাকান্তের গহনা চুরি ৬৩ ; দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া ১৯২ ; ঠাকুর সঙ্গে বৃন্দাবনে ১৯৯ ; চন্দ্র হালদারের কথা ২৫৭ ; সঙ্গে গমন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ২৬৫ ; ‘তুমি মানো আর না মানো ২৬৭ ।

হলধারী—৬১ ; ২৭১ । ন্যাঙটা—(তোতাপুরী) ২১৯ ।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়—কোন্নগরে প্রভুসঙ্গে ৭৬ ; পদ্মলোচন পণ্ডিতকে জানতে ৮৯ ; এঁড়ে বাছুর পাওয়া ৯৩ ; শিওড়ে লোক খাওয়ান ১৩১ ; রাজপথে, প্রভুসঙ্গিতে ১৮২ ।

কৃষ্ণকিশোর—নামে বিশ্বাস ৪৩ ; আমি ‘খ’ ৯৭ ।

পদ্মলোচন—রাম প্রসাদের গান শুনে কান্না ৮৯ ; ঠাকুরকে উৎসবানন্দ সহ বিচার পড়ে শোনানো ৯০ ।

শঙ্কু মল্লিক—হাঁসপাতাল করা ৪৮ ; ঐ ১৩৫ ; ‘তুমি শান্তিরাম-সি’ ২৪০ ; ‘তাই এস’ ২৭১ ।

বিষ্ণু—৬৭ । গোপালসেন—‘আমি চল্লম’ ৬৮ ।

গিরীন্দ্র—রিপুদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া ২৩৭ ।

পরিশিষ্ট ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ।

দক্ষিণেশ্বর ও রামের বাটী ।

[শ্রীযুক্ত কেশবসেন (১৮৮১) ; ৩দেবেন্দ্র ঠাকুর ;

অচলানন্দ ; শিবনাথ ; হৃদয় মুখো-

পাধ্যায় ; নরেন্দ্র ; গিরীশ ।]

৩, কার্তিক, ১৩১৭ ।

“প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থ খণ্ড কোজাগর পূর্ণিমায় দিন পেয়ে আজ দ্বিতীয়ায় শেষ করিছি । ধন্য তুমি, এত অমৃত দেশময় ছড়ালে । * * * । যাক, তুমি অনেকদিন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হ'য়েছিল জানতে চেয়েছিলে তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি । কিন্তু আমি ত আর 'শ্রীম'র মত কপাল করে আসিছি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো । যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়ত, একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলবো । আর কত ভুলে গেছি ।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন । সেদিন কেশব বাবুর আসিবার কথা । আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঘাটের থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম “পরমহংস কোথায় ?” তিনি উত্তর দিকের বারাণ্ডায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিগে বলেন “এই পরমহংস ।” কালাপেড়ে ধুতি পরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে আমি ভাবলাম “এ আবার কি রকম পরমহংস ?” কিন্তু দেখলাম দু'টি ঠ্যাং উঁচু ক'রে, আবার তাই দু'হাত দিয়ে বেঁটন ক'রে, আধাচিৎ হ'য়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হ'য়েছে । মনে হ'ল ‘এ'র কখনও বাবুদের মত তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন ।’ তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডান পাশে একটি বাবু ব'সে আছেন— সুনলাম তাঁর নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যান্টিস্ট্রাক্ট সেক্রেটারী হ'য়েছিলেন । আরও ডান দিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন । একটু পরেই রাজেন্দ্র বাবুকে বলেন, “আপো দিখিনু কেশব আসছে কি না ।”

একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বল্লেন ‘না’। আবার একটু শব্দ হ’তে বল্লেন :—“ছাথো, আবার ছাথো।” এবারও একজন দেখে এসে বল্লেন ‘না’। অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বল্লেন “পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে—ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।” ছাথো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত ? আসে, আসে, আসে না।” কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবল সহ এসে উপস্থিত।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হ’য়ে ঝুঁকে প্রণাম করলেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ ক’রে একটু পরে মাথা তুল্লেন, তখন সমাধিস্ত—বল্লেন :—

“রাজ্যের কল্‌কাতার লোক জুটিয়ে—নিয়ে এসেছেন—আমি কি না বক্তিতা ক’র্বো? তা আমি পারবো টারবো নি। করতে হয়, তুমি কর। আমি ও সব পারবো নি।”

ঐ অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বল্লেন :—

“আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবো আর বাহে যাবো। আমি ও সব পারবো নি।”

কেশব বাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হ’রে যাচ্ছেন, এক একবার ভাবের ভরে ‘আঃ আঃ’ করছেন।

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি ‘এ কি লং?’ আর ত কখনও এমন দেখি নাই, আর ‘যে রূপ বিশ্বাসী তাত’ জানই।

সমাধি ভঙ্গের পরে কেশব বাবুকে বল্লেন, “কেশব, একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বল্ছ ‘ভক্তিনদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়বো।’ আমি তখন উপর পানে তাকাই (যেখানে কেশব বাবুর স্ত্রী ও অত্যাগত স্ত্রীলোকগণ বসেছিলেন) আর ভাবি ‘তাহ’লে এঁদের দশা হবে কি?’ তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি ক’রে গিয়ে প’ড়বে? সেই নেউলের মত পেছনে বাঁধা ইট কোন কিছু হ’লে কুলঙ্গায় উঠে ব’সলো, কিন্তু থাকবে কেমন ক’রে। ইটে টানে আর ধুপ্ ক’রে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান করতে পার, কিন্তু ঐ দারাস্ত ত ইট টেনে আবার নাবিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তিনদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে আবার ডুব দেবে, আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি ক’রে?”

কেশব বাবু বল্লেন “গৃহস্থের কি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?”

লীলা প্রসঙ্গে ৩৯ ; চাঁদনীতে Lecture
৬৩ ; শক্তি মানা ৯৩ ; 'এরই লাজ
খসেছে' ১৯০ ; 'কি সরল !' ২৪২ ।
কেশবের জন্ম ঠাকুরের ক্রন্দন ১২ ।

বিজয়গোপালী—কেশ-
বের সহিত মিলন ৪৬ ; কামিনী ও
দাসত্ব ৭২ ; 'তুমি কি বাসা পাকুড়েছ ?'
১১০ ; ঠাকুর ও গুরু ১৭৩ ; ঠাকুরের
চরণ বক্ষে ধারণ ২৫১ ; 'ঢাকায় এঁকে
দেখিছি' ২৫৭ ।

মহিমাচরণ—'জাহাজ'
১৩১ ; 'কর্ম চাই বইকি' ১৮৪ ; বেদান্ত-
বিচার প্রসঙ্গে ১৯৬ ; সাক্ষনয়নে গান
২৫১ ।

কাণ্ডেন—নরেন্দ্রাদি সঙ্গে
১০০ ; সংসারী কিন্তু ভারী ভক্ত ১৯৪ ।

দর্শকভক্তগণ ।

পণ্ডিত শশধর—১৪৬ ।
রামনারায়ণ ডাক্তার—২৬৪ ।
শ্রামবল্লভ—২৭৫ ।
সদরওয়াল—১৬২ ।
বৈকুণ্ঠ—১১৬ ।
দেবেন্দ্র ঠাকুর—১৯২ ।
শিবনাথ—৫৩, ৬১, ৬৪, সত্যকথা ১০৭ ।
বিদ্যাসাগর—৯০ ।
বঙ্কিম—২৬৪ ।
বৃন্দে ঝি—১১ ।
প্রতাপমজুমদার—১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯
সিধু—১০ ।
গোবিন্দ মুখ্যে—৯৫ ।
জয়গোপাল—১১৬ ।

নিত্যগোপাল—২১৯ ।

নারায়ণ—২১০ ; ঠাকুরকে গান
গাহিতে অনুরোধ ২১৪ ; ২১৭ ।

ঈশান মুখোপাধ্যায়—
ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ও সেবা ১৪২ ;
'তোমার খুব বিশ্বাস' ২০২ ; 'সঙ্গত
কথা বলবে না ?' ২৪০ ।

মণিলাল মল্লিক—কানী
পর্যটন বৃত্তান্ত ৮৯ ; বাটীতে ঠাকুরকে
লইয়া উৎসব ১০৬ ; স্বরেন্দ্রের বাগানে
১৪১ । **প্রাণকৃষ্ণ**—২৫ ।

ষড় মল্লিক—২৬৯ ।

অমৃত সরকার—২৪৫ ।

নবগোপাল—২৫১ ।

ভূপতি—২৫০ ।

শ্রীশ—১৪৪ ।

গণেশ উকিল—১৪৪ ।

বেণীপাল—৫১, ১৭৮ ।

তারাপদ—২১১ ।

কুক্সাহেব—১৩ ।

পান্না—১৪৪ ।

প্রতাপের ভাই—১৩ ।

হরলাল—৩৩ ।

নন্দলাল—৫০ ।

হেম—২৭৮ ।

নবকুমার—৮৩ ।

অমৃত—৮৪, ১৩৭ ।

ত্রৈলোক্য—৮৪, ১৫৮, ১৬৬ ।

রজনী রায়—১১৩ ।

এ ঠাকুরের উল্লিখিত পৌরাণিক ভক্তগণ	দশরথ—১৮৯।
ব গিরিরাজ—২৭৬।	অহল্যা—২৭০, ২৭৯।
৫ হুম্মান—২৯, ২৩৭।	যশোদা—৮৪।
৭ লব কুশ—৪৬।	কাক ভূষণী—২৪১।
৮ প্রহ্লাদ—২০২, ২৩৮।	গ্রন্থোল্লিখিত শাস্ত্রাদি ও গ্রন্থকারাদি।
৯ বশিষ্ঠ—১৮৮।	গীতা—১৫৯, ১৬২, ১৭০।
শুকদেব—৯, ৯২, ১০১।	বেদান্ত—৯৭।
৬ বিভীষণ—২৪, ২৩৭।	বেদ—১৯৩।
রাবণ—১৫৪, ১৯৭, ২৩৭।	শ্রীমদ্ভাগবত—১১০।
৭ কুম্ভকর্ণ—২৩৭।	অধ্যাত্ম—১৯৪।
৮ নিকষা—৬৪।	কবিকর্ণ চণ্ডী—৯৯।
মনোদরী—২৯।	অষ্টাবক্র সংহিতা—৯৭।
জনক—৪৪, ২৩১।	Bible—১৬৫।
৯ ভীষ্মদেব—৬৪।	Science—২৪২।
অর্জুন—৬৪, ১১৩, ২৬৭।	Theosophy—২৮০।
নারদ—২৩, ৬২, ১০১, ২৩২, ২৩৮, ২৭০।	Logic—২৬।
অড়ভরত—৯২, ১৭০।	Philosophy—১০৪, ২৭৭।
দত্তাত্রেয়—৯২।	Hamilton—১০৪, ২২০।
পরীক্ষিৎ—৯২।	Faraday—২৩৯।
কালুবীর—৯৯।	Stebbing—২৬২।
শ্রীমন্ত—৯৯।	St. Paul—২৬৩।
খুল্লনা—৯৯।	Herbert Spencer—২২০।
দেবকী—১০০।	Tyndall—২২০।
	Huxley—২২০।

ঠাকুরের উল্লিখিত দেবদেবী ও অবতারাদি।

মা কালী—৩।	সীতা—৭৬, ১৫৪, ১৯৭।
ভগবতী—১৮৮, ২৭৬।	লক্ষ্মণ—৬৪, ৭৬।
শুকদেব—২৭৯।	শ্রীমতী—৮১, ২৬৬।
শ্রীরামচন্দ্র—৬৪, ৭৬, ১৫৪, ১৮৮, ২৪১,	শ্রীকৃষ্ণ—৬৪, ২৬৭।
২৭০।	জগন্নাথ—২৩৩।

ষিঙ—(ছবি) ১৮০ ; ৮৯ ; ২৬৩ ।
চৈতন্যদেব—৯, ৫৪, ৬২, ১১৩, ১৪৯ ।
শঙ্কর—২২১, ২৩৬ ।

রামানুজ—৪৬, ২২১ ।
কবীর—৫৯ ।
বীরভদ্র—৭২ ।

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব ।

মা—১৬৭, ১৭৪ ।

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি—

৩৮, ১০২, কখন অভেদ—১৭৫, ২২২ ;
মহাকালীর সৃষ্টিপ্রকরণ ৩৯, সংসার
তার লীলা ৪০ ; মায়ের মায়া—১১৭ ।

সমস্রয় যোগ—৩৬, ৩৭ ।

জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত—

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না—৫৭ ;
পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ ৫৭ ; জ্ঞানীর লক্ষণ
১৬৪, ১৬৬ ; আমি কিন্তু যায় না ৫৮,
৭৭ ; ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ৫৮,
৫৯, ২৩৩ ; অনন্তকে জানা—৬০ ;
The Unknown and Unknow-
able—১২১ ; Perception of the
Infinite ২০৮ ; ঈশ্বর লাভের লক্ষণ
৬০, ২৩৩ ; ব্রহ্মজ্ঞানে অহঙ্কার যায়—
৭৬ ; ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত—৯১ ; বিজ্ঞান
কিন্তু হয়—২৭৫ ; বেদান্তমত—
৯৭ ; সপ্তভূমি—৬০, ৭৭ ; সমাধিতত্ত্ব
সবিশুদ্ধ ও নিকিঞ্চ—৮৭ ; জ্ঞানযোগ
বড় কঠিন—৭৯, ২৩৯ ; জীবমুক্ত—
১৬৭ ; মায়াবাদ—১২৫ ; ওঁকার ও
নিত্যলীলা-যোগ—১৯৭ ; ব্রহ্মানন্দ
১৯৭ ; বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা—২০০ ;

জ্ঞান কাহাদেরহয় না—২৩৭ ; বিচার
ও ঈশ্বরলাভ—১৭, ২২৩ ; বেদান্তের
উপমা—২৬৯ ।

ভক্তিযোগ—ভক্তির উপায়

—১৬ ; কেবল শুদ্ধাভক্তি—৪৩ ;
গোপীপ্রেম—৪৫, ১২৯ ; ভক্তি-
যোগই যুগধর্ম—৪৯, ৮০ ;
দ্বিবিধা ৮০ ; ঈশ্বর দর্শনার্থ ‘পাকা’
ভক্তি—৮১ ; উত্তম ভক্ত—৯৬ ; শুদ্ধা
ভক্তি, প্রেম—১১২, কলিযুগেতে
ভক্তিযোগ—১৩৪ ; ভক্তের কি ব্রহ্ম-
জ্ঞান হয় ?—১৫১ ; ভক্তের প্রার্থনা—
—১৫২ ; ঠিক ভক্ত—১৯৮ ; ভক্তি
মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুরে যেতে পারে—
২৩২ ; অহৈতুকী ভক্তি—২৪৫ ; এক-
মাত্র ভক্তিই, সার—২৭৮ ।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-

যোগের সমস্রয়—শুদ্ধজ্ঞান
শুদ্ধাভক্তি এক—১০৪, ১৯৬ ।

জ্ঞানী ও ভক্তের

প্রভেদ—১০২ ।

কর্মযোগ ।—কর্ম ও ঈশ্বর

৪২ ; সংসার যাত্রার জন্ত যেটুকু সেই-
টুকু নিষ্কাম হ’য়ে করা ৪৮ ; বড় কঠিন
৪৯, ১৩৪ । কে অনাসক্ত কর্মী ১৩৫ ;

কলিতে কর্মযোগ
 নম্র—১৪৬; জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর
 না কর্ম ১৩৫; **কর্মকাণ্ড**
আদিকাণ্ড ১৩৫; কর্মত্যাগ ও
 ঈশ্বরলাভ ১৪৭; কর্মযোগ ও ঈশ্বর
 দর্শন ১৮৪; জ্ঞানের পর কর্ম লোকে
 সংগ্রহার্থ ২৩২; নিকাম কর্ম খুব ভাল
 কিন্তু বড় কঠিন ২৭১।

কর্ম সন্ন্যাসযোগ।—
 গৃহস্থ সন্ন্যাস ১৭, ৯৮, ২৮০।

ধ্যানযোগ।—ধ্যানের উপ-
 যুক্ত স্থান ১৬।

সন্ন্যাসযোগ।—বৈরাগ্য
 কয় প্রকার ৮৫; সন্ন্যাসী ও সঙ্ঘ
 ১১১, ১৭৭। সন্ন্যাসাশ্রম ১৮৭। স্ত্রী-
 লোক ও সন্ন্যাসী ২৪৪।

গুণত্রয় বিভাগযোগ।
 —তিনগুণ ও তাহাদের লক্ষণ ৫৪,
 ১৬৮।

**সাধকের প্রতি উপ-
 দেশ**।—ঈশ্বর দর্শনের উপায়
 ব্যাকুলতা ১৮; ঈশ্বরে ভালবাসা ১৮;
 বিশ্বাস ২৪, ৪৩; নামমাহাত্ম্য ৪৩, ৫৪;
 ‘কাদতে পার’? ৫৮; ঈশ্বর দর্শনের
 অন্তরায়—আমি বা অহং ৭৫; মুক্তির
 উপায় তীব্র বৈরাগ্য ৭০; জীবনের
 উদ্দেশ্য ‘ডুব দাও’ ১৩৮; ঈশ্বর লাভ
 কি? ১৬০; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়
 মোড় ফিরান ২৩৭; সরলতা ও ঈশ্বরে
 বিশ্বাস ২৪২; সাধনের প্রয়োজন ২৭৮।

**সিদ্ধিলাভ ও মুক্তির
 উপায়**।—উপায় তীব্র বৈরাগ্য
 ৭০; তাঁর কৃপা ৮২, ১৫৪; বিশ্বাস
 ২৪, ৪৩; ব্যাকুলতা ১৮, ১৮৬;
 নানাপথ ১৫০।

**আত্মোক্তারী বা
 শরণাগতি**।—বিড়াল ছানার
 মত মাকে ডাকা ১৮, ১৬৫; ‘মামেকং
 শরণং ব্রজ’ ১২২; আত্মোক্তারী দাও
 ১৬৫, ২৭৭; রামের ইচ্ছা—১৮৯।

সংসার।—বিবাহ ১৩;
 গৃহস্থের কর্তব্য ১৩, ১৬৫; গৃহস্থ সন্ন্যাস
 ১৭, ২৮০; গৃহস্থের—ফৌস ২২;
 উপায় ৪৪, ১১৮; বদ্ধজীব ২৪;
 তাহার লক্ষণ ৬৯; নির্জনে সাধন
 প্রয়োজন ১১৯, ২৩০; সংসারী ও
 সঙ্ঘ ১১১; এক হস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে
 রেখে সংসার করা ১১৬; সংসার কি
 অনিত্য ১১৭; রোগ বিকার, ঔষধ-
 সাধুসঙ্গ ১২২, ১৬৩; গৃহে সাধন
 ১৪০; নিলিপ্ত সংসার ১৬৭; তাহার
 উপায় ১২৮, ২৩০; সংসারত্যাগ কখন
 ১৮৮; সংসারীর জ্ঞান ও তদ্বিত্ত
 জ্ঞান ২৩১; গৃহস্থ ও নিকামকর্মে ১।

শাস্ত্র।—বেদ ও তন্ত্রে; যয়
 ৩৭; কলিকালে শাস্ত্র ১৪৬; শাস্ত্র কি
 আছে ১৬১, ১৮৫, ২১৩।

ব্রাহ্মসমাজ।—প্রতিমা ১৫;
 ব্রাহ্মসমাজ ও গুরুগিরি ৪৬;
 ব্রাহ্মসমাজ ও কর্মযোগ ৪৮; ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ৬৩; ব্রাহ্ম- ১৭৫, ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্ম ১৭৬;
সমাজ ও লেখচার ১৩৭; নিরাকার ব্রাহ্মসমাজ ও অসভ্যতা ১৯৩; ধর্ম-
বাদ ১৬০; ব্রাহ্ম সমাজ ও সাম্য বিদ্যেভাব ১৭৭। খৃষ্টানী ও ব্রাহ্ম-
১৬২; আদ্যাশক্তি ও ব্রাহ্মসমাজ সমাজের 'পাপ'—১৬৫।

বিবিধ ।

বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ ১২০, ১৯৬;

ৱ--৬৪।

লেখচার—১৫।

সংস্কার—৬৭।

মাহত নারায়ণ—২০।

আত্মহত্যা—৬৮।

ভিন্ন প্রকৃতি—২৩, ১৬৮।

অবতারবাদ—২০৮, ২২০, ২২২, ২৪০,

পাপবোধ—১২১।

২৫৩।

পাপপুণ্য—২৭৭।

নিত্যসিদ্ধ—৮৬।

জীব চার প্রকার—৬৯, ১৬৯।

অষ্টসিদ্ধি—১৫৯।

বদ্ধজীব—৬৯, ১৬৯, ১৭০।

শুধু পাণ্ডিত্য—৯০, ১১৩, ১৬১।

আচার্য্য তথা বৈদ্য ত্রিবিধ—৫৬, ১৫৩,

পাণ্ডিত্য ও বিবেকবৈরাগ্য—১৪৭,

২৪৩, ২৪৪।

২৩৯।

গুরু এক সচ্চিদানন্দ—৪৬, ৭৫, ১৭৩।

সাধু কে—১১৯।

আদেশ—৪৭, ৭৪, ৯২।

দল (সাম্প্রদায়িকতা)—৯২।

কামিনী ও কাঞ্চন—৬৯, ৭২, ৭৩, ১৪০।

তীর্থ—১৫২।

অহঙ্কার—(টাকার) ৭৬, (শরীরের)

ডাক্তারী ব্যবসা—২৫৪।

১৬৮; তাহার ঔষধ—১১৪।

উকিলের ব্যবসায়—১৪৪।

আমি—বজ্জাৎ—৭৭; দাস—৭৮,

Duty (কর্তব্য)—২৭০।

পাকা—৯২, কাঁচা—২৩৫; মুক্ত

Free will—২৬৭, ২৬৯।

আমি—৯৮; আমি ও আমার

সংবাদ পত্র—২১৮, ২৪২।

১৩৯; বালকের আমি ও ভক্তের

লজ্জা ঘৃণা ভয়—১১২।

আমি—২৩৬, বুড়োর আমি—

দানগ্রহণের কুফল—২১০।

২৩৭।

সিদ্ধাই—২৮০।

সত্যকথা—১০৭।

গুরু পূজা—২৮১।

মিথ্যা—৮৬।

সূক্ষ্মশরীর—২৭৮।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

উপক্রমণিকা ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে ?

সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত ।

ঠাকুরের জন্ম—পিতা খুদিরাম ও মা চন্দ্রমণি—পাঠশালা—৬রঘুবীর সেবা—সাধুসঙ্গ ও পুরাণ শ্রবণ—অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন—কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অদ্ভুত 'ঈশ্বরীয়' রূপ দর্শন—ঠাকুর উন্মাদবৎ—কালীবাড়ীতে সাধুসঙ্গ—তোতাপুরী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ—তত্ত্বোক্ত ও পুরাণোক্তি সাধন—ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত কথাবার্তা—তীর্থদর্শন—ঠাকুর ও অন্তরঙ্গ—ঠাকুর ও ভক্তগণ—ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ—হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সর্বধর্মসমন্বয়—ঠাকুর ও জ্বীলোক ভক্ত—ভক্ত পরিবার ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন । ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার ; ১২৪১ সাল, ইংরাজি ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ । কামারপুকুরগ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার কোশ পশ্চিমে, আর বর্ধমান হইতে ১২।১৩ কোশ দক্ষিণে ।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বৎসরকাল ছিলেন ।

ঠাকুরের পিতা ৬খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নির্ভাবান্ ও পরম ভক্ত ছিলেন । ঠাকুরের মা ৬চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন । পূর্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল । ঐ গ্রাম কামারপুকুর হইতে দেড় কোশ দূরে । সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় খুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই । পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর । পাঠশালে সামান্য লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৬রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন ।

নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্য পূজা করিতেন। পাঠশালে 'শ্রীমদ্ভগবতী ধাঁধা লাগতো'।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় স্বকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাহিয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন—এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এক দিন মাঠ দিয়া বাড়ীর নিকটবর্তী গ্রাম অতুড়ে যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাহুশূণ্য হইলেন। লোকেরা বলিল যুঁহী,— ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল।

খুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে, থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতে, কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলেন। ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন (ইংরাজি ৩১শে মে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) *। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে। মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও শ্রীযুক্ত শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

* এ সমস্ত রাণীরামমণীর কালীবাড়ীর বিক্রী কওলা হইতে লওয়া হইয়াছে।

Deed of Conveyance ; "Date of purchase of the Temple grounds 6th September 1847 ; Date of Registration 27th August 1861 ; price of the Dinajpur Zemindary which supports the Temple Rs 2,26,000."

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রাম-বাটী গ্রামস্থ ৩৮রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীশারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীশ্রীমার বয়স ছয় বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পর তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন! আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না! পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন।

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের গ্রায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অগ্নি ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের উপর মথুর বাবু এই পূজার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা মা করেন। কখন জড়বৎ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার গ্রায় থাকেন! কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন! কখনও বালকের গ্রায়! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসিতেন না। সর্বদাই মা মা!

কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সুধু সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন। একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্ঝিকল্প সমাধি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্বে আসিয়াছেন; তিনি ঠাকুরকে তত্ত্বোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও তাঁহাকে শ্রীগোরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অগ্নি বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। তোতার কাছে শ্রীঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী —তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন ও বলিতেন—‘বাবা! বেদান্ত শুনো না,—ওতে ভার ভক্তি সব ক’মে যাবে।’

বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলু-টোলায় চৈতন্যসভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবারিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্য-সভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে,—প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্ত পাগল! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহারও কখনও অন্তর্দিশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ); কখন অর্দ্ধবাহু; কখনও বা বাহুদশা!

ঠাকুর মা মা করিয়া কাদিতেন—সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন। মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, ‘মা তোর কথা কেবল শুন্বো; আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করবো।’ ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, যিনিই পরব্রহ্ম, অথও সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, ‘তুই আর আমি এক! তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্ত। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।’ ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীতে গিয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতেন, “ওরে ভক্তেরা, তোরা কোথায় কে আছিস্ শীঘ্র আয়!”

মাতা চন্দ্রমণী দেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রূপান্তর জ্ঞান করিতেন ও সেই ভাবে পূজা করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্বর্গলাভের পর মাতা পুত্র-শোকে কাতরা হইয়াছিলেন; তিন চার বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাড়ীতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখাইয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ও ‘মা কেমন আছ’ জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার তাঁহার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে ও মথুর বাবুর কয়েকটি পুত্র। তাঁহার অবস্থান্তরের ৫৬ বৎসরের মধ্যে। তখন ঠাকুর অহর্নিশি প্রায়ই সলাধিহ বা ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। এবার বৈষ্ণনাথ দর্শনান্তর ৬কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার তীর্থ গমন ইহার ৭৮ বৎসর পরে—মথুর বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ যাত্রায়

৬ কানীধায়, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন। কাশীতে সমাধিস্থ হইয়া যণিকণিকায় বিশ্বনাথের গম্ভীর চিত্তরূপ দর্শন করেন—মুমুর্ষুদিগের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম দিতেছেন। আর মৌনব্রতধারী ত্রৈলোক্যস্বামীর সহিত আলাপ করেন। মথুরায় ঋবঘাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে সঙ্ক্যা সময়ে ফিরতী গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দেখু লইয়া যমুনা পার হইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি লীলাভাব চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন; নিধুবনে রাধাপ্রণেমে বিভোরা গঙ্গামাতার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের ‘কাপ্তেন,’ এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁতির গোপাল (‘বুড়ো গোপাল’) ও মহেন্দ্র কবিরাজ কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭২, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্বদা সমাধিস্থ—কখনও জড় সমাধি—কখনও ভাব সমাধি! সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে! সর্বদাই মা মা!

রাম ও মনোহন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র, তার পর আসিলেন; চুনী, লাটু, নৃত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১র শেষ ভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী, সুবোধ, সাম্মাল; ১৮৮৪ মধ্যে গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি; দেখিতে দেখিতে ছোট নরেন্দ্র, পলটু; পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোগিন, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নব-গোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণ-কৃষ্ণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখো), সাধু প্রিয়নাথ (মুখো), বিনোদ, তুলসী, হরিশ মুস্তফী, বসান্থ, কথক ঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোয়গরের বিপিন, বিহারি, ধীরেন, রাখাল (হালদার) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিজ্ঞাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও ডাক্তার সরকার, বক্রিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির (ঘোষ), নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইহারারও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলোক্য স্বামীর কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে বন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

• অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শত্ৰু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইন্দ্রেশ্বর গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আখ্যায়িকাজের দয়ানন্দ, ইহারারও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর, এবং সিওড় শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, কালী (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মনিলাল, উমেশ, হীরালাল, ভবানী, নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্ত সর্বদা যাইতেন ; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ, দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ—উপাসনাকালে—দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা, কখন ভক্ত সঙ্গে কখন একাকী, আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত !

ঠাকুর সর্বধর্মসম্বন্ধার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপর দিকে আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

এক দিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, ‘মা তোর খুঁটান ভক্তেরা তোকে
কি রূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।’ কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া
এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া
আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, ‘আমি খাজাখীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—
ভাবিলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।’

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা
বলিয়াছিলেন ও ‘গোপালের মা’ বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই
তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত
দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি
হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন
কি, পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন।
মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, ‘মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হ’লে কিন্তু
মা, গলায় ছুরি দিব!’

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা
গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুতে অনেকের
নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে—রামকৃষ্ণ, পতু, তুলসী, শান্তি,
শশী, বিপিন, হীরালাল, নগেন্দ্র, (মিত্র), উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি;
ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও
ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর আজ তাঁহারা কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেন।
মাদ্রাস, লক্ষাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই,
পাঞ্জাব, জাপান; আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড, সর্বস্থানে ভক্ত পরিবার
ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইতি—

জন্মাষ্টমী, ১৩১০।

কলিকাতা।

}

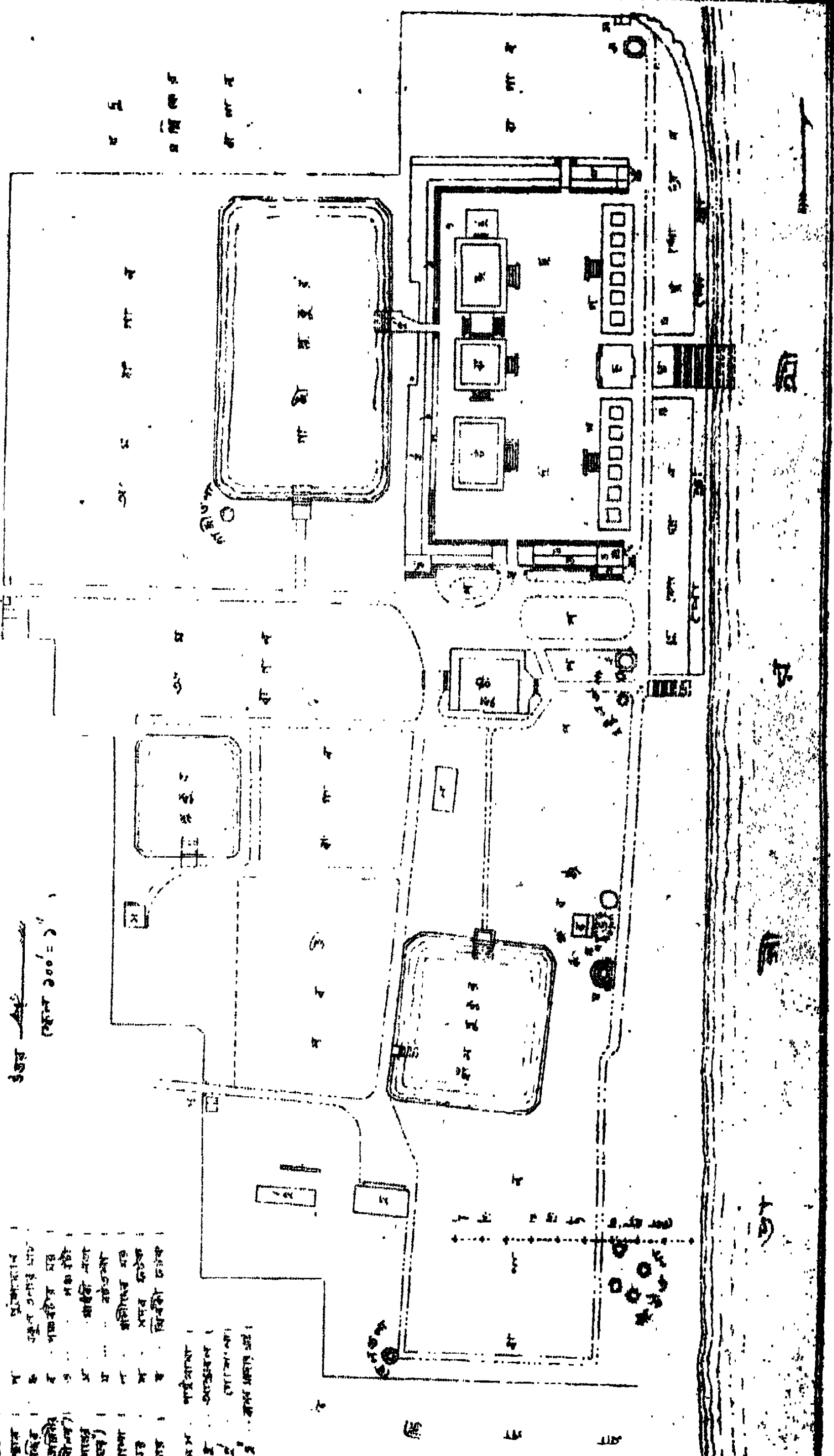
—

1.

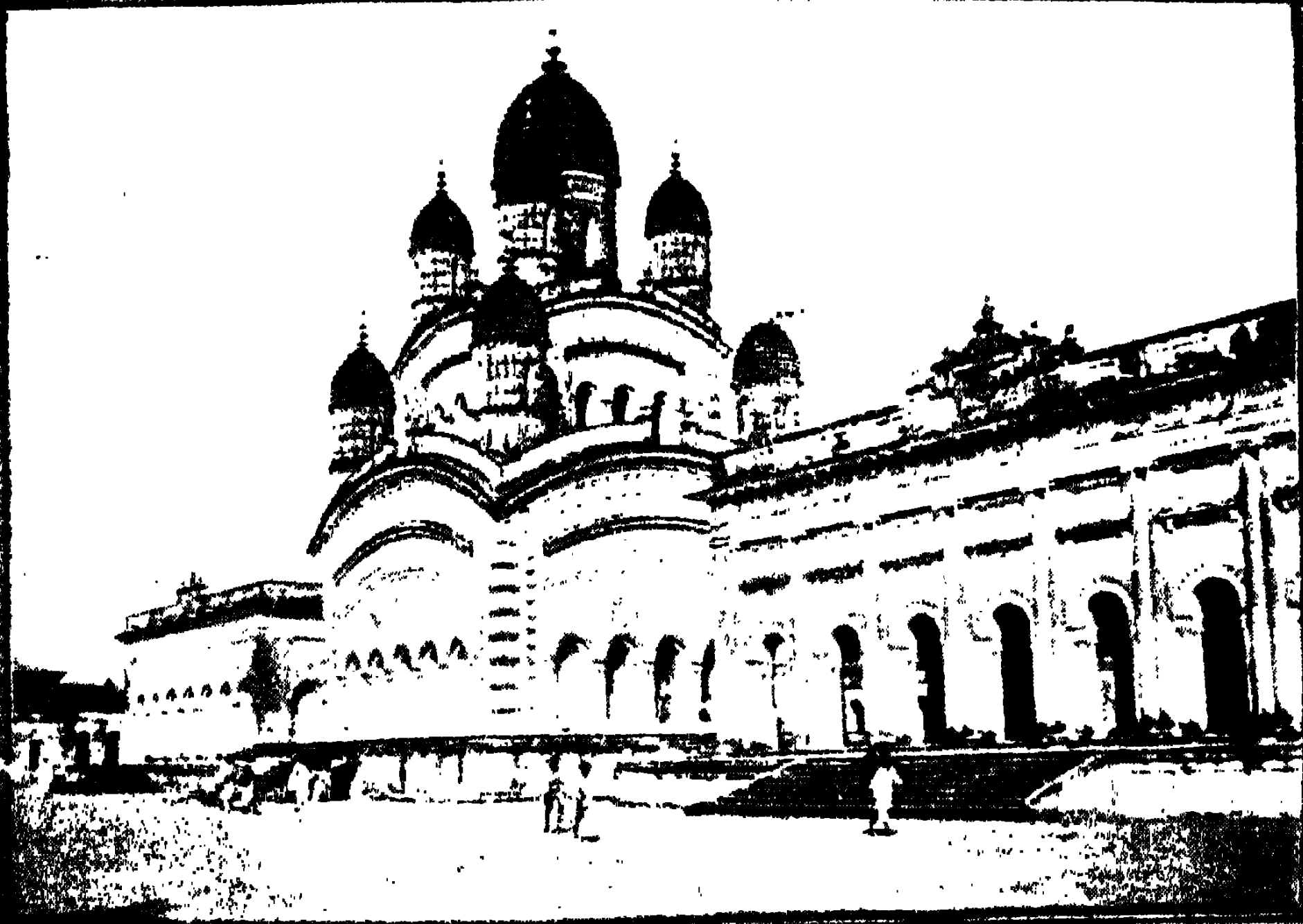
[illegible]

10

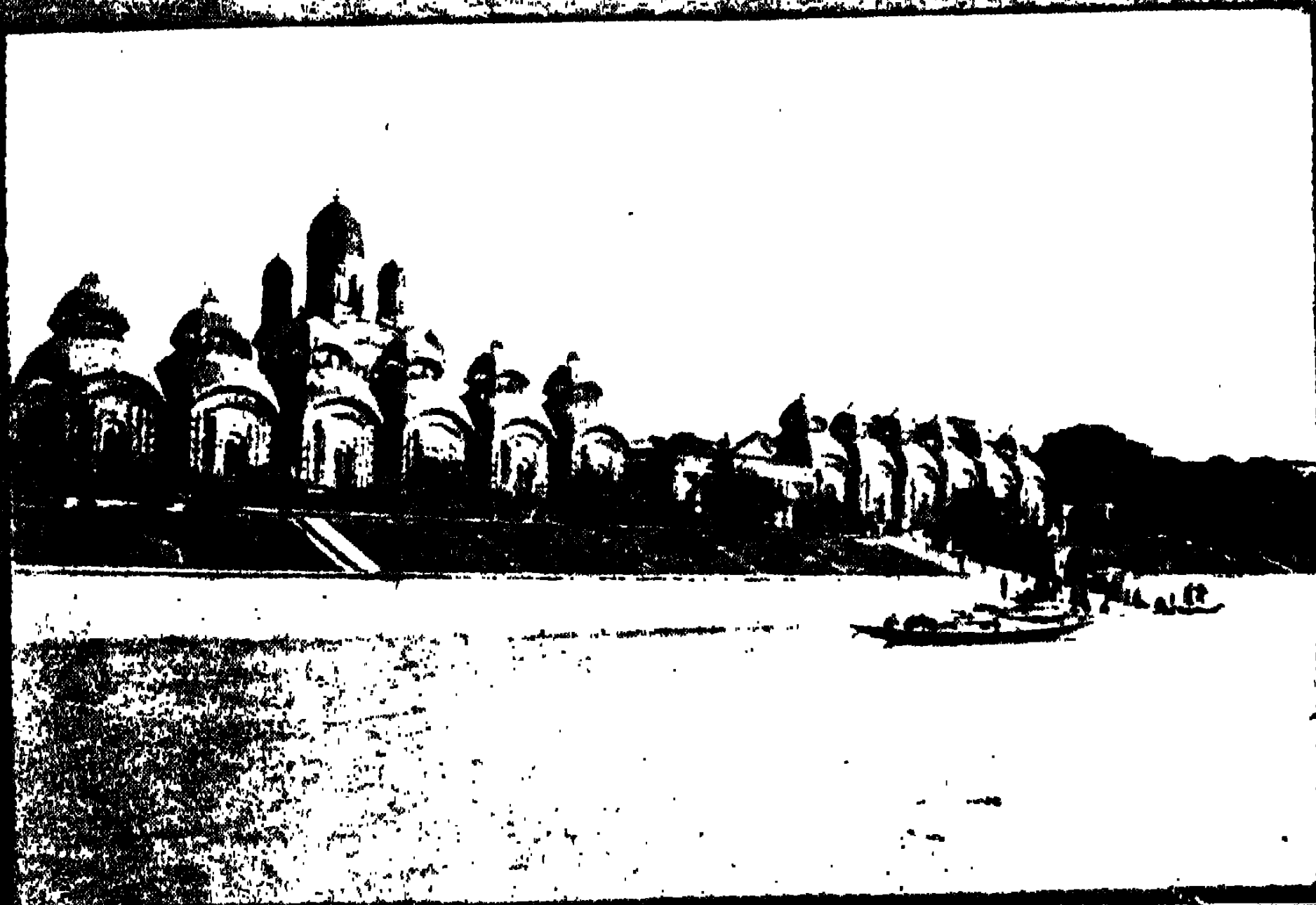
1. (= 000 0000)



দক্ষিণে—রাসমণ্ডির কালীবাড়ি।



প্রাঙ্গণে দৃশ্য



চাঁদগীর দক্ষিণে দৃশ্য

১ম চিত্র—মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে ৬ রাধাকান্তের মন্দির

২য় চিত্র—চাঁদগীর উভয় পার্শ্বে ছয়টি করিয়া শিবমন্দির। উত্তরের শেষ—
উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর। চাঁদগী ও শিবমন্দিরের পশ্চিমে পুণে
চাঁদগীর সম্মুখে বাঁধাঘাট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

প্রথমভাগ-প্রথমখণ্ড ।



দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

১। কালীবাড়ী ও উদ্যান* ।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীমধ্যে । ২। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির । ৩। পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর । ৪। ভবতারিণী মা-কালী । ৫। নাটমন্দির । ৬। ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা । ৭। বলিদানের স্থান । ৮। ভোগঘর । ৯। দপ্তরখানা । ১০। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর । ১১। নহবৎ ও বকুলতলা । ১২, ১৩। পঞ্চবটী । ১৪। ঝাউতলা ও বেলতলা । ১৫। কুঠী । ১৬। বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কী ফটক । ১৭। হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা । ১৮, ১৯। পুষ্পোদ্যান । ২০। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা । ২১। 'আনন্দনিকেতন' ।

১। আজ রবিবার । ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিতেছেন । সকলেরই অব্যাহত দ্বার । যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন । সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী ; শাক্ত, বৈষ্ণব ; পুরুষ, স্ত্রীলোক ; সকলেই আসিতেছেন । ধন্য রাণী রাসমণি ! তোমারই স্বকৃতিবলে

* রাণী রাসমণীর বাগানের নক্সা দেখ

এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই চঞ্চলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে !

২। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির ।

কালীবাড়ীটা কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নোকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্থ হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকীদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটি লোটা সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু, ককির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হ'লে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নোকা-যাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী !'

৩। পাকা উঠান ও বিষ্ণুশ্রয় ।

চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে ৮রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ; পশ্চিমাস্থ হইয়া আছেন। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দির-তল মন্দিরপ্রস্তরাস্থ। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে। এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটা দ্বারবান্ পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রোজে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, এই জন্ত ক্যাম্বিশের পরদার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পায়ে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসি। ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রথম পূজারীর কার্য্যে ব্রতী হন।

৪। শ্রীশ্রীভবতারিণী মা কালী ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা । মার নাম ভবতারিণী । শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তুত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদী । বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন । শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তুতনির্ম্মিত । তাহার হৃদয়োপরি বাণারসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃত এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্রামাকালীর প্রস্তুতময়ী মূর্ত্তি । শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাংজেব, চুটকী—আর জবা বিষ্ণুপত্র । পাংজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে । পরমহংসদেবের ভারি সাধ, তাই মথুরাবাবু পরাইয়াছেন । মার হাতে সোণার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি । অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পইচে, বাউটি ; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু ; তাবিজের ঝাঁপা দোহুলামান । গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোণার বস্ত্রিশ নর, তারাহার ও স্বর্ণনির্ম্মিত মুণ্ডমালা ; মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস ; ফুলঝুম্‌কো, চৌদানী ও মাছ । নাসিকায় নং, নোলক দেওয়া । ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাভয় । কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা । মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বিচিত্র শয্যা ;—মা বিশ্রাম করেন । দেওয়ালের একপাশে চামর ঝুলিতেছে । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যঙ্গন করিয়াছেন । বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল । তলার সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্রামার পান করিবার জল । পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল । বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তুরের বৃষ ও ঈশানকোণে হংস । বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় স্তম্ভ সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা ; একপাশে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্ম্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্ত্তি, ও বাণেশ্বর শিব । আরও অন্যান্য দেবতা আছেন । দেবী প্রতিমা দক্ষিণাশ্রা । ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে, ঘটস্থাপনা হইয়াছে । সিন্দূররঞ্জিত, পূজাস্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত, মঙ্গলঘট । দেওয়ালের একপাশে জলপূর্ণ তামার ঝারি ;—মা মুখ ধুইবেন । উর্দ্ধে মন্দিরের চাক্ষুসী, বিগ্রহের পশ্চাদ্‌দিকে সুন্দর বাণারসী বস্ত্রধও লঙ্ঘমান । বেদীর চারি কোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ । তদুপরি বহুমূল্য চক্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে । মন্দির দুহারা । দালানটীর কয়েকটা ফুকর হৃদয় কপাট দ্বারা

৫। নাটমন্দির।

বিষ্ণুঘরের জন্তু রান্না নিরামিষ । কালীঘরের ভোগের জন্তু ভিন্ন রন্ধনশালা । রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বাঁটা লইয়া মাছ কুটিতেছে । অমাবশ্যায় একটা ছাগ বলি হয় । ঠাকুরদের ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায় । ইতি-মধ্যে অতিথিশালায় এক এক খানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কান্দাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি, আসিয়া বসিয়া পড়ে । ব্রাহ্মণদের পৃথকস্থান করিয়া দেওয়া হয় । কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয় । খাজাঞ্জীর জন্তু প্রসাদ তাঁহার ঘরে পছন্দাইয়া দেওয়া হয় । জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠীতে থাকেন । সেইখানেই প্রসাদ পাঠান হয় ।

৯। দপ্তরখানা।

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঙ্গী, মুহুরী সর্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী, দাস দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণ-দিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে যে একতলা ঘরের শ্রেণী আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ত্রায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

১০। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেশ্বর ঘর।

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাশ্রু হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারাণ্ডার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পুতসলিলা কলকলনাদিনী গঙ্গা।

১১। নহবৎ ও বকুলতলা।

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীর ৮গঙ্গালাভ হয়।

১২, ১৩। পঞ্চবটী।

বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে সর্বদা পাদ-চারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বথ, নিম্ব, আমলকী ও বিষ্ণু—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাব-ধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে বৃক্ষ-

ছড়াইয়া দিয়াছিলেন । এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব গায়ে একখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন । এই কুটির এক্ষণে পাকা হইয়াছে ।

পঞ্চবটীমধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে । তৎসঙ্গে একটি অশ্বখগাছ । দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে । বৃদ্ধ গাছটি বয়সাদিক্যবশতঃ বহুকোটির-বিশিষ্ট ও নানাপাক্ষিসমাকুল ও অগ্ন্যাগ্ন জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে । পাদপমূল ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত । এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন ; আর বৎসের জন্ত যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ভাকিতেন ! আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বখের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে । ডালটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই । মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে । বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোনও মহাপুরুষ জন্মেন নাই ।

১৪, ১৫ । ঝাউতলা ও বেলতলা । কুঠী ।

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে । সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা । সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ । ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা । এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন । ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর । তাহারই উত্তরে গবর্ণমেন্টের বাক্সদঘর (Magazine) ।

উঠানের দেউড়ী হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী । ঠাকুরবাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরাবাবু প্রভৃতি এই কুঠীতে থাকিতেন । তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন । এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয় ।

১৬ । বাসনমাজার ঘাট, গাজিতলা ও দুই ফটক ।

উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুকুরিণী । মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট । ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে । ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে

যাইলে আবার একটি দেউড়ী, বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক । এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোকে যাতায়াত করেন । দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন । কলিকাতার লোক প্রায়ই এই ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করেন । সেখানেও দ্বারবান্ বসিয়া পাহারা দিতেছে । কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান্ চাবি খুলিয়া দিত । পরমহংসদেব দ্বারবান্কে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন, ও লুচিমিষ্টাঙ্গাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন ।

১৭ । হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা ।

পঞ্চবটীর পূর্বদিকে আর একটি পুষ্করিণী, নাম হাঁসপুকুর । ঐ পুষ্করিণীর উত্তরপূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা । গোশালার পূর্বদিকে খিড়কী ফটক । এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায় । যে সকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন ।

১৮, ১৯ । পুষ্পোদ্যান ।

উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধায়া দিয়া পথ গিয়াছে । সেই পথের দুইপাশে পুষ্পবৃক্ষ । বকুলতলা হইতে পঞ্চবটী পর্যন্ত মাঝে মাঝে বামপাশে পুষ্পবৃক্ষ । আবার কুঠীর দক্ষিণপাশ দিয়া পূর্বপশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পাশে পুষ্পবৃক্ষ । গাজিতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত, কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী আছে ।

অতি প্রত্যুষে পূর্বদিক্ রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সন্মুখ শব্দ হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিনী বাজিতে থাকে তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয় । গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিষ্ণুবৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুল্চী ফুলের গাছ । মল্লিকা, মাধবী ও গুল্চী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন । মাধবীলতা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া পুঁতিয়া দিয়াছিলেন । হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ । কিয়দূরে কুম্ভকাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প । বেড়ার উপর অপরাজিতা—নিকটে জুই, কোথাও বা সেকালিকা । দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী,

গোলাপ, জুই, বেল। কচিং বা ধুতুরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনিষ্ঠিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ইত্যাদি; আবার পঞ্চমুখী জবা, চীনজাতীয় জবা, এই সব ফুলের গাছও আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অন্তর্ভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল! অর্মানি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহ-নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

২০। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারাণ্ডা ।

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারাণ্ডা। বারাণ্ডার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখে। এ বারাণ্ডায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন। এই পূর্ব বারাণ্ডার অপরাধি উত্তরমুখে। এ বারাণ্ডায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন, আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কত বার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারাণ্ডায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারাণ্ডায় একদিন নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

২১। আনন্দ নিকেতন।

কালীবাড়ী আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। এক দিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট

মনোহর পুষ্পোদ্ভান । তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন ! আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব ! নহবৎ হইতে রাগরাগিণী সর্বদা বাজিতেছে ! একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গল-রতির সময় । তার পর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয় । তার পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান । আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন । তার পর আবার সন্ধ্যারতির সময় । অবশেষে রাত নয়টার সময় যখন শীতলের পর ঠাকুরের শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

১৮৮২—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস ।

[প্রথম দর্শন ।]

তব কথামৃতং তপজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবিগুণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায় ।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী । মা-কালীর মন্দির । বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস । ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে । সন্ধ্যা হয় হয় । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত । এই প্রথম দর্শন । মাষ্টার দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিতেছেন । ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্ত্র হইয়া সহাস্ত্রবদনে হরিকথা কহিতেছেন । ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন ।

[কথ্যত্যাগ কখন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন । তাঁহার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে । অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দস্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করিতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, “যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই

জেনো যে সঙ্ক্যাতি কর্ম আর করতে হবে না । তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে । তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার, জপ্লেই হ'ল ।” আবার বলিলেন, “সঙ্ক্যা গায়ত্রীতে লয় হয় । গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয় ।”

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন । সিধুর* সঙ্গে এ বাগানে বেড়াইতে এসেছেন । আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে এসেছেন । শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুয়োর বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন । তখন সিধু বলিয়াছিলেন, ‘গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখতে যাবেন ? সেখানে একজন পরমহংস আছেন ।’

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন । মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন, “আহা কি সুন্দর স্থান ! কি সুন্দর মানুষ ! কি সুন্দর কথা ! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা ক'রছে না ।” কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘একবার দেখি কোথায় এসেছি । তার পর এখানে এসে ব'সব ।’

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল । এককালে কাসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল । বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল । সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল । মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল ! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে । ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে ! মাষ্টার, দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন । সিধু বলিলেন, “এটা নামমণির দেবালয় । এখানে নিত্যসেবা । অনেক অতিথি, কান্দাল আসে ।”

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন । এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া ।

এই মাত্র ধূনা দেওয়া হইয়াছে । মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ

* শ্রীযুক্ত সিধুর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়া ।

প্রবেশ করিতে পারিলেন না । দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল । মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন ?”

বৃন্দে । হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন ।

মাষ্টার । ইনি এখানে কতদিন আছেন ?

বৃন্দে । তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার । আচ্ছা ইনি কি খুব বই টাই পড়েন ?

বৃন্দে । আর বাবা বই টাই ! সবই ওঁর মুখে :

মাষ্টার সবে পড়া শুনা ক’রে এসেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন ।

মাষ্টার । আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা ক’রবেন ?—আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি ?—তুমি একবার খবর দিবে ?

বৃন্দে । তোমরা যাও না বাবা ! গিয়ে ঘরে বোসো ।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন । ঘরে ধূনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ । মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বঙ্কাজলি হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করিতে এসেছ,” ইত্যাদি । মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন । কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্তমনস্ক হইতেছেন । পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব । যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে । মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না ; এ ঠিক সেইরূপ ভাব । পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহশূন্য হ’ন ।

মাষ্টার । আপনি এখন সন্ধ্যা ক’রবেন, তবে এখন আমরা আসি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) । না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয় ।

আর কিছু কথা-বার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । ঠাকুর বলিলেন, “আবার এসো ।”

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এ সৌম্য কে ?—যাহার কাছে

আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে ?—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয় ?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে । ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো ।—কাল কি পরশ্ব সকালে আবার আসিব ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ ।

অথ গুণমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময় । ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন । এখনও ঐ ফুট শীত আছে । তাই তাঁহার গায়ে moleskinএর র্যাপার । র্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া । মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ ? আচ্ছা, এখানে বসো ।

এ কথা দক্ষিণ-পূর্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল । নাপিত উপস্থিত । সেই বারাণ্ডায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন । গায়ে ঐরূপ র্যাপার ; পায়ে চটী জুতা ; সহাস্রবদন । কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোতলা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ই্যাগা, তোমার বাড়ী কোথায় ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, কলিকাতায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে কোথায় এসেছ ?

মাষ্টার । এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি । ঈশান কবিরাজের বাটী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওহ্, ঈশানের বাড়ী ।

(শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও ঠাকুরের মার কাছে কন্দন ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । ই্যাগা, কেশব কেমন আছে ? বড় অস্থখ হয়েছিল ।

মাষ্টার । আমিও শুনেছিলুম বটে ; এখন বোধ হয় ভাল আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি আবার কেশবের জন্ত মার কাছে ডাব-চিনি মেনে-ছিলুম । শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কান্দতুম ; বলতুম, মা কেশবের অস্থখ ভাল ক'রে দাও ; কেশব না থাকলে আমি কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব ? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম ।

“হ্যাঁগা, কুক্সাহেব না কি একজন এসেছে ? সে না কি লেকচার দিচ্ছে ?
আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল । কুক্সাহেবও ছিল ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে ; কিন্তু আমি তাঁর লেকচার
শুনি নাই । আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না ।

(গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রতাপের ভাই এসেছিল । এখানে কয়দিন ছিল । কাজ
কর্ম নাই । বলে, আমি এখানে থাকুব । শুনলাম, মাগছেলে সব শব্দরবাড়ীতে
রেখেছে । অনেকগুলি ছেলে-পিলে । আমি বকলুম । (মাষ্টারের
দেখ দেখি, ছেলে-পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ায় এসে
থাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ ক’রবে ? লজ্জা করে না ।) তাদের আর
একজন থাওয়াচ্ছে, আর তাদের শব্দরবাড়ীতে রেখেছে ! আমরা অনেক
বকলুম, আর কর্ম কাজ খুঁজে নিতে পারিনি । তবে এখান থেকে যেতে চায় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নতিমিরাক্ষণ জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

কুম্বীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । তোমার কি বিবাহ হ’য়েছে ?

মাষ্টার । হ্যাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চিহ্নিত) । ওরে রামলাল ! * যাঃ বিয়ে ক’রে ফেলেছে !

মাষ্টার ঘোর রাগে শ্রীরামকৃষ্ণের গায় অবাক হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া
বসিয়া রহিলেন । মাষ্টার লাগিলেন, বিয়ে ক’রা কি এত দোষ !

ঠাকুর আবার তিরস্কার করিলেন, তোমার কি ছেলে হ’য়েছে ?

মাষ্টারের বুক টিপ টিপ করিতে লাগিল । ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আজ্ঞে—
ছেলে হ’য়েছে । তখন মাষ্টার আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—
যাঃ ছেলে হ’য়ে গেছে !

তিরস্কৃত হইয়া মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন ।

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুরের পুত্র ও কালীবাড়ীর পুজারী ।

তাঁহার অহংকার চূর্ণ হইতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সম্মুখে বলিতে লাগিলেন, দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোক এ সব দেখলে বুঝতে পারি । * * * *

“আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিজ্ঞাশক্তি না অবিজ্ঞাশক্তি ?

(জ্ঞান কাহাকে বলে ?)

মাষ্টার । আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । আর তুমি জ্ঞানী ?

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই । এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয় । এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল ; তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান । ঠাকুর বলিলেন—‘তুমি কি জ্ঞানী !’ মাষ্টারের অহংকারে বিশেষ আঘাত লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, তোমার ‘সাকারে’ বিশ্বাস, না ‘নিরাকারে’ বিশ্বাস ?

(প্রতিমা-পূজা ।)

মাষ্টার (অবাক হইয়া, স্বগত) । সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস কি হইতে পারে ? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে ? যদি জিনিষ, তুচ্ছ, কি আবার কালো হ’তে পারে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বেশ । একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ’ল । নিরাকারে বিশ্বাস, তাত ভালই । তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটী কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা । এইটী জেনো যে, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য । তোমার যেটা বিশ্বাস, সেইটাই ধ’রে থাকবে ।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন । একথা ত তাঁহার পুণ্ড্রিগত বিচার মধ্যে নাই !

মাষ্টারের অহংকার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল । কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই । তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ’ল । কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি ত ন’ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার “চিন্ময়ী প্রতিমা” কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে পূজা করা উচিত; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

[লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যার জগৎ তিনি বুঝাবেন! যিনি এই জগৎ ক’রেছেন, চন্দ্র সূর্য্য ক’রেছেন, মানুষ জীব জন্তু ক’রেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় ক’রেছেন, পালন ক’রবার জন্তু মা বাপ ক’রেছেন, মা বাপের স্নেহ ক’রেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় ক’রেছেন, আর এ উপায় ক’রবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অস্বাভাবিক। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হ’য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্তু মাথা বাধা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর!

এইবার মাষ্টারের অহংকার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ~~ভাবিতে~~ লাগিলেন, ইনি যা ব’লছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি, না আমার তাঁর উপর ভক্তি হ’য়েছে! “আপনি শুভে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।” জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অক্সফোর্ড, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা ব’লছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত মাষ্টারের এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটির প্রতিমা পূজা ব’লছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক’রেছেন। যার জগৎ, তিনিই এ সব ক’রেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

“এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম আয়োজন ক’রেছেন—যার যা পেটে সয়। কা’রও জন্তু মাছের পোলোয়া, কা’রও

জন্তু মাছের অস্থল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন । যেটা যার ভাল লাগে । যেটা যার পেটে সয় ।—বুঝ্‌লে ?”

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ ।

নমোহস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

[ভক্তির উপায় ।]

মাষ্টার (বিনীত ভাবে) । ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা ক'রতে হয় । আর সংসার ঈশ্বরের তক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয় । সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না । মাঝে মাঝে নিৰ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার । প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নিৰ্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন ।

“যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয় । বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে ।

“ধ্যান ক'রবে মনে, কোণে ও বনে । আর সর্বদা সদম্য বিচার ক'রবে । ঈশ্বরই সৎ, কিনা, নিত্যবস্তু ; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য । এই বিচার ক'রতে ক'রতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক'রবে ।

মাষ্টার (বিনীতভাবে) । সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে ?

[গ্রহস্থ-সন্ন্যাস । উপায়—নিৰ্জনে সাধন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সব কাজ ক'রবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে । স্ত্রী পুত্র, বাপ মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে । যেন কত আপনার লোক । কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয় ।

“বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন প'ড়ে আছে । আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে । বলে, ‘আমার রাম’ ‘আমার হরি ।’ কিন্তু মনে বেশ জানে —এরা আমার কেউ নয় ।

“কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান ?

—আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম ক'রবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

“ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার ক'রতে যাও, তাহ'লে আরও জড়িয়ে প'ড়বে। বিপদ শোক তাপ এ সব অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা ক'রবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

“তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঁটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

“কিন্তু এই ভক্তি লাভ ক'রতে হ'লে নির্জ্ঞন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জ্ঞনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না। তার পর নির্জ্ঞনে ব'সে, সব কাজ ফেলে, দই মছন ক'রতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

“আবার দেখ, এই মনে নির্জ্ঞনে ঈশ্বর চিন্তা করলে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

“সংসার জল, আর মনটা যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জ্ঞনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।

“সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ হয় না। তাই, টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?”

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি প'ড়েছি, তাতে আছে “বস্তুবিচার।”

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চরুবি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে তুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়]

মাষ্টার । ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ইহা অবশ্য করা যায় । মাঝে মাঝে নির্জনে বাস ; তাঁর নাম জপ গান, বস্তু-বিচার ; এই সব উপায় অবলম্বন করিতে হয় ।

মাষ্টার । কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । খুব ব্যাকুল হ'লে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায় । মাগ ছেলের জন্ম লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্ম লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্ম কে কাঁদছে ? ডাকার মত ডাকতে হয় ।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

গীত ।

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্রামা থাকতে পারে ।

কেমন শ্রামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥

মন যদি একান্ত হও অবা বিষদল লও ।

ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

“ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল । তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন । ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন ।

“তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান । এই তিন টান যদি ক'রও এক সঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে পারে ।

“কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে । যা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, মতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে । এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র ক'রলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয় ।

“ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই । বিড়ালের ছাঁনা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে । যা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখনও হেঁশালে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয় । তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে, আর কিছু জানে না । যা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে ।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দর্শন।

“সর্বভূতস্বমাখ্যানং সর্বভূতানি চাখ্যানি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥” গীতা।

[নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাক্টার।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মুক্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্রি দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অকসর হইয়াছে তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্রবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটা উনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। তিনি কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অল্পমানে বুঝিলেন যে, কথাটা বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা ‘কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম ধর্ম করে’ তাদের ঐ সকল ব্যক্তির নিন্দা করে। আর সংসারে কত ছুটে লোক আছে তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী

লোকেরা কত কি বলে । কিন্তু ঠাখ, হাতী যখন চ'লে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে । কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না । তাকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'রবি ?

নরেন্দ্র । আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । না রে অতো দূর নয় । (সকলের হাস্য) । ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন । তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয় । বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন ; তা ব'লে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না । (সকলের হাস্য) । যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো । তার উত্তর এই যে, যারা ব'লছে 'পালিয়ে এসো', তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি ।

"একটা গল্প শোন । কোন এক বনে একটি সাধু থাকে । তাঁর অনেকগুলি শিষ্য । তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার ক'রবে । একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্ত কাঠ আন্তে বনে গিছলো । এমন সময়ে একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগ্লা হাতী যাচ্ছে !' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না । সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই ব'লে দাঁড়িয়ে রইল ; আর নমস্কার ক'রে স্তব স্তুতি ক'রতে লাগলো ; এ দিকে মাহুত চৈচিয়ে বলছে, 'পালাও' 'পালাও' । শিষ্যটি তবুও নড়ল না । শেষে হাতীটি শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল । শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ও অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইল ।

"এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল । আর ঔষধ দিতে লাগলো । খানিক ক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চ'লে গেলেনা ?' সে ব'লে, 'গুরুদেব যে আমায় ব'লে দিছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হ'য়েছেন । তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে স'রে যাই নাই ।' গুরু তখন বল্লেন বাবা, 'হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ ক'রেছিলেন । যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস ক'রলে না কেন ? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয় । (সকলের হাস্য) ।

“শাস্ত্রে আছে ‘আপো নারায়ণঃ’—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে; আবার কোন জলে অঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুই লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐক্লপ লোকের কাছ থেকে তাকাতে থাকতে হয়।”

• একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুই লোকে অনিষ্ট ক’রতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ’লে কি চুপ ক’রে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস ক’রতে গেলেই, দুই লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট ক’রবে ব’লে, উটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

“এক মাঠে রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটা ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে ব’লে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী ব’লে, বাবা তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা ব’লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ’লে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটা মন্ত্র প’ড়লে, অর্ধনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প’ড়ে রইল। ব্রহ্মচারী ব’লে, ধর্ম! তুই কেন পরের হিংসা ক’রে ক’রে বেড়াস, আর তাকে মন্ত্র দিব।

মন্ত্র জ’পলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্ লাভ হবে, আর হিংসা প্রতি থাকবে না। এই ব’লে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে তাকে প্রণাম ক’রলে, আর জিজ্ঞাসা ক’রলে, ঠাকুর! কি ক’রে সাধনা হবে বলুন। গুরু ব’লেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা কোঁরো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় ব’লে, আমি আবার আসবো।

“এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কাষড়াতে আসে না। ঢালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হ’য়ে গেছে।

এক দিন এক জন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ্ ধ'রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হ'য়ে প'ড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে ক'রুলে যে সাপটা ম'রে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চ'লে গেল।

“অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'লো। তখন সে আন্তে আন্তে অতি কষ্টে তার গর্ভের ভিতর চ'লে গেল। শরীর চূর্ণ হ'য়ে গিছলো। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্মসার হ'য়ে গেছে, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চ'রতে আসতো। ভয়ে দিনের বেলা আসত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে প'ড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ ক'রতো।

“প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান ক'রুলে। রাখালেরা ব'লে, সে সাপটা ম'রে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিস্ত ও কথা বিশ্বাস হ'লো না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে বেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে, তাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিতাবে প্রণাম ক'রুলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা ক'রুলে “তুই কেমন আছিস্?” সে ব'লে, “আজ্ঞে ভাল আছি।” ব্রহ্মচারী ব'লে, “তবে তুই এত রোগা হ'য়ে গিছিস্ কেন?” সাপ ব'লে, “ঠাকুর! আপনি আদেশ ক'রেছেন,—ক'রও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা, ফলটা খাই ব'লে বোধ হয় রোগা হ'য়ে গিছি!” ওর সম্বন্ধে হয়েছে কি না, তাই কার উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে, রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার যোগাড় ক'রেছিল! ব্রহ্মচারী ব'লে, “শুধু না ঝাওয়ার দক্ষণ একরূপ অসম্মত হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দেখ্।” সাপটার ওয়ে মনে প'ড়লো যে, রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে এই? “ঠাকুর, এখন মনে প'ড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তার অজান, তারা তো জানে না যে, আমার মনের কি অবস্থা; র'র যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট ক'রবো না, তারা কেমন ক'তা জানবে?” ব্রহ্মচারী ব'লে, “ছি! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা ক'র না। জানিস্ না; আমি কামড়াতেই বারণ ক'রেছি, কোঁচ ক'রতে নয়। ত' ক'রে তারের তর দেখাস্ নাই কেন?”

“দুই লোকের কাছে কেঁচো ক’রতে হয় । ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে । তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, উল্টে অনিষ্ট ক’রতে নাই ।

[ভিন্ন প্রকৃতি । Are all men equal ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পাল্লা আছে । জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে ; মন্দ আছে । বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে । গাছের মধ্যে অমৃতের গ্রায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফল হয় এমন আছে । তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে ; সাধু আছে, অসাধুও আছে ; সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে ।

“জীব চার প্রকার ;—বন্ধজীব, মুমুকুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব ।

“নিত্যজীব ;—যেমন নারদাদি । এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ।”

“বন্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হ’য়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না । মুমুকুজীব ;—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে । কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ’তে পারে, কেউ বা পারে না ।

“মুক্তজীব ;—যারা সংসারে কামিনী কাকনে আর বন্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা ; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে ।”

“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে । দু’চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাঙ্গল । কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে । এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে ; এরা মুমুকুজীবের উপমাঙ্গল । কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না । দু’চারটা ধপাড্ ধপাড্ ক’রে জাল থেকে পালিয়ে যায় ;—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল ! কিন্তু যারা জালে প’ড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না । আর পালাবার চেষ্টাও করে না । বরং জাল মুখে ক’রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চূপ ক’রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, ‘আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি ।’ কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্ হড়্ ক’রে টেনে আড়ায় তুলবে ! এরাই বন্ধজীবের উপমাঙ্গল ।

[সংসারী লোক ; বন্ধজীব ।]

“বন্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাকনে বন্ধ হ’য়েছে । হাত পা বাঁধা ।

আবার মনে করে যে, ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই স্থখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে । জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে । বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, ‘তুমি তো চ’লে, আমার কি ক’রে গেলে ?’ আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সলতে জ্বলে বদ্ধজীব বলে, ‘তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও ।’ এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে ।

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না । যদি অবসর হয়, তা হ’লে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে । জিজ্ঞাসা ক’রলে বলে, আমি চূপ ক’রে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি । হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ ক’রলে !” (সকলে শুক ।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

“যোমামজমনাদিক বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মৰ্ত্তেষু সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” গীতা, ১০, ৩ ।

[উপায়—বিশ্বাস ।]

একজন ভক্ত । মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অবশ্য উপায় আছে । মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ক’রতে হয় আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা ক’রতে হয় । আর বিচার ক’রতে হয় । তাঁর কাছে প্রার্থনা ক’রতে হয়, ‘আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও ।’

“বিশ্বাস হ’য়ে গেলেই হ’ল । বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই ।

(কেদারের প্রতি) “বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ’ল । কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস ক’রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল ! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই । (সকলের হাস্য ।)

“বিভীষণ একটা পাতায় রামনাম লিখে, ঐ পাতাটা একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিচ্ছিল । সে লোকটা সমুদ্রের পারে যাবে । বিভীষণ তাকে ব’লে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক’রে জলের উপর দিয়ে চ’লে যাও ; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস ক’রবে, অমনি জলে ডুবে যাবে । লোকটা বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চ’লে যাচ্ছিল । এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ’ল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার তাকো । খুলে দেখে

যে, কেবল রামনাম লেখা র'য়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি! শুধু রামনাম একটা লেখা র'য়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

“যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ ক'রবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।” এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে লাগিলেন—

[গীত : মহাপাতক ও নাম-মাহাত্ম্য ।]

“আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে না যদি মরি।

আথেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ব্রহ্ম, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।

এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের ব'লেন—

“এই ছেলেটিকে দেখ্‌ছ, এখানে এক রকম। দূরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি; আবার চাঁদনিতে যখন ফুল, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাকে। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

“বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা প'ড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিম প'ড়তে থাকে। ডিম প'ড়তে প'ড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা প'ড়তে থাকে। প'ড়তে প'ড়তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে প'ড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।”

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। আখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া শুনা সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্-কচ্ ক'রে কেটে দিতে লাগল! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য।)

(মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে না ?

মাষ্টার । আছে হাঁ, ইংরাজীতে লায়শাস্ত্র (Logic) আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি ।

মাষ্টার এইবার মুস্থিলে পড়িলেন । বলিলেন—

“এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান । যেমন,
—সব মানুষ ম’রে যাবে ; পণ্ডিতেরা মানুষ ; অতএব পণ্ডিতেরা ম’রে যাবে ।

“আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান । যেমন,—এ কাকটা কালো ; ও কাকটা কালো ; (আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো ; অতএব সব কাকই কালো ।

“কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত ক’রলে ভুল হ’তে পারে ; কেননা, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল । আর এক দৃষ্টান্ত,—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে ; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ’ল যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় । আরো এক দৃষ্টান্ত,—এ মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে ; ও মানুষটির বত্রিশ দাঁত ; আবার যে কোন মানুষ দেখছি, তারই বত্রিশ দাঁত আছে । অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে ।

“এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী লায়শাস্ত্রে আছে ।”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র । শুনিতে শুনিতেই অন্তমনস্ক হইলেন । কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন তে যদা হ্যস্ততি নিশ্চলা ।

সমাধাযচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্তসি ॥ গীতা, ২, ৫৩ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে’]

সভাভঙ্গ হইল । ভক্তেরা এদিক ওদিক পাইচারি করিতে লাগিলেন । মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বেলা আন্দাজ পাঁচটা । কিয়ৎকণ পরে মাষ্টার ঠাকুর-শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারান্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে !

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন । নরেন্দ্র গান করিতে—

ছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখন কোথাও শুনে নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিম্পন্দ, চক্কর পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! ভিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সন্মাদ্রি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনে নাই! অবাক হইয়া তিনি ভারিতে লাগিলেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়! গানটী এই—

গীত।

“চিন্তায় মম মানস হরি চিদ্রূপ নিরঞ্জন।

(কিবা) অরূপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।

নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত; (কিবা) বিজলি চমকে,

সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।”

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি ‘কোটি শশী বিনিন্দিত’ কি অরূপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্তার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

“হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,

দেখ শাস্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।”

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিম্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

“চিদানন্দরসে, ভক্তিয়োগাবেশে, হওরে চিব্বরগন।

(চিদানন্দরসে, হাবরে) (প্রেমানন্দরসে)”

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্ত-কারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল,—

‘প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন !’ (হরি প্রেমে মত্ত হয়ে) ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ দর্শন ।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মনুতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে ॥ গীতা, ৬, ২২ ।

[নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে আনন্দ ।]

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল । বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন । মেজাতে মাদুর পাতা । সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই একজন বসিয়া আছেন । কয়টিই ছোকরা ; উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স । ঠাকুর সহাস্রবদন, ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা করিতেছেন ।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, ‘ঐ রে আবার এসেছে !’—বলিয়াই হাস্য । সকলে হাসিতে লাগিল । মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন । আগে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে । কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন । তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন । তিনি বলিলেন,—

“আম্ব, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল । তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মোতান্ত ধ’রেছিল—তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে । (সকলের হাস্য) ।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন । বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব । এখানে কে যেন টেনে আনলে ! মনে ক’রলে অন্য যায়গায়

যাবার যো নাই, এখানে আস্তেই হবে! এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফটিনাটি করিতে লাগিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়া ছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার ক'রে ছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জানী' ব'লেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য ব'লেছিলেন? ইনিই কি আমায় ব'লেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকতে ব'লেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আখ্, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুসী ক'রছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে ব'সে আছে।” মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, ‘দেখ হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহস্থ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়! যখন ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে বললে—

(গীত। ‘শ্রীরাম কল্পতরু’।)

আমার কি ফলের অভাব।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল; মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ॥

শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে ব'সে রই—যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।

ফলের কথা কই (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই; যাব তোদের প্রতিকল যে দিয়ে ॥

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর এই গান গাইতে লাগিলেন। আবার সেই সমাধি। আবার নিম্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ

ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুসী করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্ত হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে লাগিল। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর ‘রাম’ ‘রাম’ এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ঘচ্‌কিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক।’

ঠাকুর পূর্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের গ্রাম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ব’লেন,—“তোমরা দু’জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো।” মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু’জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না।

—:—

দশম পরিচ্ছেদ।

স্বমকরং পরমং বেদিতব্যং, স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্।

স্বমব্যয়ঃ শাস্ত্রতদ্ব্যর্থগোপ্তা, সনাতনস্তং পুরুষোমতো মে ॥

গীতা, বিশ্বরূপদর্শন, ১১, ১৮।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে। ‘আমি কে?’]

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরে ও বাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুরবাড়ীর এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, খুহুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের

উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ, আর একটু বেশী বেশী আস্বি। সবে নূতন আস্বিস্ কিনা। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি। (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাস্য); কেমন আস্বি তো?” নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হাঁ, চেষ্টা ক’রবো।”

আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, চাষারা হাটে গরু কিন্তে যায়। তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক’রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।” এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। “আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাং ভ্যাং করছে!”

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, “তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বল্বে কি বকম ছেলে।”

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি। ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জলিতেছিল। কীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন। যেন মস্তমুগ্ধ সর্প। একণে সঙ্কচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আর কি গান হবে?” ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, আজ আর গান হবে না।” এই

বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, “তবে এক কথ্ব কোরো ।
আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে ।”

মাষ্টার । যে আজ্ঞা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি জান ? বলরাম বসু ?

মাষ্টার । আজ্ঞা না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বলরাম বসু । বোসপাড়ায় বাড়ী ।

মাষ্টার । যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা ক’রবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে) । আজ্ঞা
তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের তোমার কি
বোধ হয় ?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন । ঠাকুর আবার বলিলেন,—

“তোমার কি বোধ হয় ? আমার কয় আনা জ্ঞান হ’য়েছে ?

মাষ্টার । ‘আনা’ এ কথা বুঝিতে পারছি না ; তবে একপ
জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা
উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হানিতে লাগিলেন ।

একপ কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

মহর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন । আবার
নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত ।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন । একাকী ;—
নিঃসঙ্গ । পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছে ।
আত্মারাম ; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে, ভালবাসে ! ‘অনপেক্ষ’ !

অবাক হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আবার যে ফিরে এলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা বোধ হয় বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না ;
তাই সেখানে যাব না ভাবছি । এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক’রব ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না গো, তা কেন ? তুমি আমার নাম ক’রবে । বল লব্ধে
তার কাছে যাব, তা হ’লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে ।

মাষ্টার ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের
নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন ।

[১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে’ ।]

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা । শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন । বিজয়
(গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন । একজন আসিয়া
বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত ।

কেশবের শিয়োরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়,
জাহাজ আসিয়াছে, আপনাকে যাইতে হইবে ; চলুন একটু বেড়াইয়া আসিবেন ;
কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন ।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে । ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন ।
সঙ্গে বিজয় । নৌকায় উঠিয়াই বাহুশূন্য । সমাধিস্থ ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ-চিত্র দেখিতেছেন । তিনি বেলা
৩টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন । বড়
সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাহাদের আনন্দ । বড় সাধ, শুনি-
বেন তাহাদের কথাবার্তা । কেশব তাহার সাধুচরিত্রে ও বস্তুতাবলি মাষ্টারের
শ্রদ্ধা অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন । অনেকেই তাহাকে পরম
আশ্রয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন ; কেশব ইংরাজীপড়া লোক ; ইংরাজী
দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন । তিনি আবার দেব-দেবী পূজাকে অনেকবার
পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন । এইরূপ লোক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি প্রকাশ
আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন ; এটি বিষ্ময়কর ব্যাপার বটে !
তাঁহাদের মনের মিল কোন্ খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে

মাষ্টারাদি অনেকেই কোতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকারবাদী; ত্র্যক্ষের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন। আবার খাট কিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর মত, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী; শ্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন, আবার সংবাদপত্র লেখেন ও বিষয় কৰ্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্বদিকে অনতিদূরে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী। জাহাজের আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে ছাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহীদের দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি, ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটি, নহবৎখানা। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্তী উজ্জানপথ; ও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা আকৃষীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব! উদ্বেগ হ্রাস, সুন্দর সুন্দর অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিয়ে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, ঝাঁহার তীরে আর্ধ্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন! আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, যেন সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম্ম! একরূপ দর্শন মাতৃমের কপালে সর্বদা ঘটে না। একরূপ স্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্বেক হয়, কোন্ পাষণ্দহৃদয় না বিগলিত হয়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। -

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার, নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহার্য জীর্ণাশ্চাত্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গীতা, ২, ২২ ।

[সমাধি-মন্দিরে ।]

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইতেছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশবাস্ত

হইলেন । ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল । এখনও ভাবস্থ । একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন । পা নড়িতেছে মাত্র । জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । কেশবদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হঁস নাই । ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, খানকতক চেয়ার । একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল । কেশব একখানিতে বসিলেন । বিজয় বসিলেন । অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন । অনেক লোকের স্থান হইল না । তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন ।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিহু ! সম্পূর্ণ বাহুশূণ্য । সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন । কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে । বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কাণ্ডের বিবরণে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন ; তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত হইলেন । কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন । ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন ।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন । ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল । এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে ! ঠাকুর আপনি আপনি অক্ষুটস্বরে বলিতেছেন, “মা, আমায় এখানে আনুলি কেন । আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক’রতে পারব ?”

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তির বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্মে হাত পা বাধা ? তাহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিষগুলি দেখিতে পাইতেছে, আর মনে করিতেছে যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহস্থ ও বিষয়কর্ম, ‘কামিনী ও কাঞ্চন’ ? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, “মা, আমায় এখানে আনুলি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক’রতে পারব ?”

ঠাকুরের ক্রমে বাহুজ্ঞান হইতেছে । গাজিপুরের নীলমাধব বাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন ।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) । মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন । তিনি গাজিপুরে থাকেন । আপনার মত আর একজন ।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না । ঈষৎ হাস্ত করিলেন ।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) । মহাশয়, পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন ।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্ত করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—“খোলটা !”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি । শ্রীতা, ৫, ৫ ।

[জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়]

‘বালিস ও তার খোলটা ।’ দেহী ও দেহ । ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না ? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী । অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে ? দেহ অনিত্য জিনিষ, এর আদর ক’রে কি হবে ? বরং যে ভগবান্ অন্তর্ধামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত ?

ঠাকুর এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । তিনি বলিতেছেন ;—

“তবে একটি কথা আছে ! ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাসস্থান । তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষরূপে আছেন । যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানে থাকতে পারে । তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে । ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা । (সকলের আনন্দ) ।

[এক ঈশ্বর—তাঁহার ভিন্ন নাম । জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ।]

“জ্ঞানীরা ঐকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান্ বলে ।

“একই ব্রাহ্মণ । যখন সে পূজা করে, তা’র নাম পূজারী ; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন । যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধ’রে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে । ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীবনয়, জগৎ নয় । এইরূপ বিচার ক’রতে ক’রতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় । ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ;

নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্ম কি যে, তা বুঝে বলা যায় না ; তিনি যে একজন ব্যক্তি,* তাও বলবার ঘো নাই ।

“জানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা । ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয় । আগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয় । জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না । ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য । আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব জন্তু এ সব ঈশ্বর ক’রেছেন । তাঁরই ঐশ্বর্য্য । তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে । আবার বাহিরে আছেন । উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হ’য়েছেন । ভক্তের সাধ যে, চিনি খায় । চিনি হ’তে ভাল-বাসে না । (সকলের হাত) ।

“ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? হে ভগবান ‘তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস,’ ‘তুমি মা, আমি তোমার সন্তান,’ আবার ‘তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা ।’ ‘তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ’ । ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে, ‘আমি ব্রহ্ম’ ।

“যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক’রতে চেষ্টা করে । উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ । যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক’রতে চেষ্টা করে । তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্ত-মন হ’য়ে ধ্যান চিন্তা করে ।

“কিন্তু একই বস্তু । নাম ভেদমাত্র । যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্ । ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম ; যোগীর পরমাত্মা ; ভক্তের ভগবান্ ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

স্বমেব হৃদ্যা স্বং বুল্য ব্যক্তাব্যক্তরূপিনী ।

নিরাকারাপি সাকার কছাৎ বেদিতুমর্হতি ।

মহানির্ঝণতঃ চতুর্থোজাস, ১৫ ।

[বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় ; আত্মাশক্তির ঐশ্বর্য্য ।]

এ দিকে আর্যের পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল । যবের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী

* ব্যক্তি-ব্রহ্ম, Personal God.

কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে ?

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন,—সহাস্রবদন, আনন্দময়, প্রেমামুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! এদিকে ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ, এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে, বিচার ক'রতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

“কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার ঘো নাই। ‘আমি ধ্যান ক'রছি,’ ‘আমি চিন্তা ক'রছি,’ এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

“তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি :—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না; সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

“দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

“তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে, ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।*

“আত্মাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তাঁরই নাম কালী।

“কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম রূপ ভেদ।

“যেমন জল ‘water’ পানি । এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে । এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে ‘জল’ । এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে ‘পানি’ । আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে ‘water’ ।

“তিনি একই ; কেবল নামে তফাৎ ! তাঁকে কেউ ব’ল্ছে ‘আল্লা’ ; কেউ ব’ল্ছে ‘God’ ; কেউ ব’ল্ছে ‘ব্রহ্ম’ ; কেউ ব’ল্ছে ‘কালী’ ; কেউ কেউ ব’ল্ছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা ।

কেশব (সহাস্ত্রে) । কালী কত ভাবে লীলা ক’রছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন ।

[মহাকালী ও সৃষ্টি-প্রকরণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । তিনি নানাভাবে লীলা ক’রছেন । তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্যামাকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী । মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তত্ত্বে আছে । যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, অগ্নিবী ছিলনা ; নিবিড় অঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকার। মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক’রছিলেন । শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী । গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয় । যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা ক’রতে হয় । শ্যামাকালীর সংহার মূর্ত্তি । শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনী মধো ; শ্যামাকালীর উপর থাকেন । রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটিতে নব হস্তের কোমরবন্ধ ।

“যখন জগৎ নাশ হয়, মহা প্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন । গির্গির কাছে যেমন একটা স্নাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গির্গির পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে । (কেশবের ও সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । হ্যাঁ গো । গির্গিরের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে । তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাধা শশাবীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি, এই সব রাখে । দরকার হ’লে বার করে । মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন ।

“সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন । জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধো থাকেন । বেদে আছে ‘উর্গনাভি’র কথা ; মাকড়সা আর তার জাল । মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা’র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে । ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় দুই ।

[‘কালীত্রয়া’ ;— কালী নিগুণ ও সগুণ ।]

“কালী কি কালো ? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয় ।

“আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ । কাছে ছাখো কোন রং নাই ! সমুদ্রের জল
দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো, কোন রং নাই !”

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে ।

কালরূপ দিগম্বরী,—হুৎপন্ন করে আলো রে ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ গীতা, ৭, ২৩ ।

[এ সংসার কেন ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) । বন্ধন আর মুক্তি ; দুয়ের কতাই
তিনি । তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া
হ’লেই মুক্ত হ’য়ে যায় । তিনি ‘ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী’ ।

এই বলিয়া ঠাকুর গঙ্গকর্ণনির্মিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন—

“শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি” (ভব সংসার বাজার মাঝে)

(ঐ যে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী ॥

কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা (তাতে) পঙ্করাদি নানা নাড়া ।

ঘুড়ি স্বপুণে নির্মাণ করা, কারিগিরি বাড়াবাড়ি ॥

বিষয়ে মেজেছ মাজা, করুণা হ’য়েছে দড়ী ।

ঘুড়ি লক্ষের তুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি ।

ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥”

“তিনি লীলাময়ী ; এ সংসার তাঁর লীলা । তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী ।

লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন ।”

একজন ব্রাহ্মতন্ত্র । মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত ক’রতে
পারেন । কেন তবে আমাদের সকলকে সংসারে বদ্ধ ক’রে রেখেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর ইচ্ছা । তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন । বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে, আর দৌড়াদৌড়ি ক'রতে হয় না । সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা হয় কেমন করে ? সকলেই ছুঁয়ে ফেলে বুড়ী অসহ্য হয় । খেলা চলে বুড়ির আহ্লাদ হয় । তাই লঙ্কের ছুটা একটা কাটে, ভেসে দাও মা হাতচাপড়ি ।' (সকলের আনন্দ ।)

“তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে ব'লে দিয়েছেন, ‘যা : এখন সংসার ক'রগে যা’ । মনের কি দোষ ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয় । তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয় ।’ ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান ক'রে গান গাইতেছেন ।

“আমি ত্রি খেনে খেনে করি ।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি ॥

মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি ।

আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি এসব তোমারি চাতুরী ॥

কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি ।

যদি দিতে পেতে, নিতে, খেতে দিতাম, খাওয়াতাম তোমারি ॥

যশ, অপযশ, স্বরস কুরস, সকল রস তোমারি ।

(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি ।

প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখিঠারি ।

(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

“তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হ'য়েছে । প্রসাদ বলে, ‘মন দিয়েছ মনেরে আঁখিঠারি ।’

[কর্মযোগ, সংসার ও নিকাম কর্ম ।]

ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয়, সব ত্যাগ না ক'রলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । নাগো ! তোমাদের সব ত্যাগ ক'রতে হবে কেন ? তোমরা রসে বসে বেশ আছে । সারে মাতে । (সকলের হাস্য ।) তোমরা বেশ আছে । নক্স খেলা জান ? আমি বেসি কাটিয়ে জলে গেছি তোমরা খুব শেয়ানা । কেউ দশে আছে ; কেউ ছয়ে আছে ; কেউ পাচে আছে । বেসি কাটাও নাই ; তাই আমার মত জলে যাও নাই । খেলা চলছে । এতো বেশ ! (সকলের হাস্য ।)

“সত্য বলছি, তোমরা সংসার ক’রছো, এতে দোষ নাই । তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে । তা না হ’লে হবে না । এক হাতে কৰ্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ’রে থাকো । কৰ্ম শেষ হ’লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে ।

“মন নিয়ে কথা । মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত । মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপবে । যেমন ধোপাঘরের কাপড় । লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ । যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে । দেখনা, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে । ফুটফাট ইটমিট (সকলের হাত) আবার পায়ে বুটজুতা ; শিষ দিয়ে গান করা : এই সব এসে জুটবে ! আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তা হ’লে অমনি শোলোক ঝাড়বে । মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা, হ’য়ে যাবে । যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তাহা হ’লে ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে ।

“মন নিয়েই সব । এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান : একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে ! কিন্তু একই মন !

—*—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ গীতা ১৮, ৬৬ ।

[খৃষ্টধৰ্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) । মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত । আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার রক্তন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান ; রাজাধিরাজের ছেলে ; আমার আবার বাঁধে কে ? যদি সাপে কামড়ায়, ‘বিষ নাই’ জোর ক’রে বলে বিষ ছেড়ে যায় ! তেমনি ‘আমি বন্ধ নই, আমি মুক্ত,’ এই কথাটা রোক ক’রে বলতে বলতে তাই হ’য়ে যায় । মুক্তই হ’য়ে যায় ।

“ঈষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে । আমি পড়ে শুনাতে ব’ললুম । ভাতে কেবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ’ !

(কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ‘পাপ’ । যে ব্যক্তি ‘আমি বদ্ধ,’ ‘আমি বদ্ধ,’ বার বার বলে সে শালা বদ্ধই হ’য়ে যায় ! যে রাত দিন ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ এই করে সে তাই হ’য়ে যায় ।

“ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—‘কি ! আমি তাঁর নাম ক’রেছি আমার এখনও পাপ থাকবে ! আমার আবার পাপ কি ! আমার আবার বন্ধন কি !’ কৃষ্ণকিশোর পরমহিন্দু ; সঙ্গাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ । সে বৃন্দাবনে গি’ছিল এক দিন ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল । একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে । তাকে বলে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্ ? তুই কি জ্ঞাত ? সে বলে, ঠাকুর মহাশয় আমি হীন জ্ঞাত : মুচি । কৃষ্ণকিশোর বলে, তুই বল শিব । নে, এখন জল তুলে দে ।

“ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ’য়ে যায় ।

“কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন ? একবার বল যে, অস্তায় কৰ্ম্ম যা ক’রেছি আর করবো না । আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর ।”

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতে লাগিলেন—

আমি দুর্গা দুর্গা নলে মা যদি মলি ।

আথেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥ (২৫পৃষ্ঠা)

“আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়ে ছিলাম । ফুল হাতে ক’রে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম ; ব’লেছিলাম, ‘মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও’ ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন ।

আম্ন মন বেড়াতে লবি ।

কালীকল্পতরুমে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।

ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তব্বকথা তায় সুধাবি ॥

শুচি অশুচিরে লয়ে দিবা ঘরে কষে শুবি ।

যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥

অহঙ্কার অবিজ্ঞা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি ।

যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য্যখোঁটা ধ'রে র'বি ॥

ধন্যধন্য দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি ।

যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি ॥

প্রথম ভাষ্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি ।

যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিদ্ধি মাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি ।

তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি ॥

“সংসারে ঈশ্বর লাভ হ'বে না কেন ? জনক রাজার হ'য়েছিল । এ সংসার “ধোকার টাটি” প্রসাদ ব'লেছিল । তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ ক'রলে আবার— এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি ।

জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ক্রটি ।

সে যে এদিক ওদিক ছদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি ॥ (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা । গৃহস্থের উপায় ।]

“কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না । ~~জনক রাজা~~ নির্জনে অনেক তপস্যা ক'রেছিলেন । সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস ক'রতে হয় । একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্ত তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল । এমন কি, অবসর পেয়ে এক দিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল । লোকে মাগ ছেলের জন্ত এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদছে বল ? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্ত সাধন ক'রতে হয় । সংসারের ভিতর, বিশেষ কক্ষের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির ক'রতে অনেক ব্যাঘাত হয় । যেমন ফুটপাথের গাছ ; যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে । প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয় ; গুঁড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না । তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না ।

“রোগটা হ'চ্ছে বিকার ! আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল । যদি বিকারের রোগী আরাম ক'রতে চাও, তা হ'লে ঘর থেকে ঠাই নাড়া ক'রতে হবে । সংসারী, জীব বিকারের রোগী ; বিষয়, জলের জালা ; বিষয়ভোগতৃষ্ণা, জলতৃষ্ণা । আচার তেঁতুল মনে ক'রলেই মুখে জল সরে । কাছে আনতে হয় না । এরূপ জিনিষও ঘরে রয়েছে । ঘোষিতসক । তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার ।

“বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক’রে সংসার ক’ত্তে হয় । সংসার সমুদ্রে কাম
ক্রোধাদি কুমীর আছে । হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে
না । বিবেক বৈরাগ্য হলুদ । সদসং বিচারের নাম বিবেক । ঈশ্বরই সৎ,
নিত্য বস্তু । আর সব অসৎ, অনিত্য, দুই দিনের জন্ম । এইটী বোধ ।

“আর ঈশ্বরে অমুরাগ । তাঁর উপর টান—ভালবাসা । গোপীদের কুঞ্জে
উপর ষেরূপ টান ছিল । একটা গান শোন ।

বাঁশী বাজিল ঐ বিপিনে ।

(আমার তো না গেলে নয়) (শ্রাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)

তোরা যাবি কি না যাবি বল গো ॥

তোদের শ্রাম কথার কথা । আমার শ্রাম অন্তরের ব্যথা (সই) ॥

তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে । বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে ॥

শ্রামের বাঁশী বাজে, ‘বেরাও রাই’ । তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই ॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণনয়নে এই গান গাহিতে গাহিতে কেশবাদি ভক্তদের বল্লেন,
“রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও ; ভগবানের জন্ম কিলে
এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো । ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায় ।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সংনিয়মোদ্ভিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ । গীতা, ১২, ৪ ।

ভাঁটা পড়িয়াছে । আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে ।
তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো ঋনিকটা বেড়াইয়া
আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে । কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল,
অনেকেরই তাহা জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা
শুনিতেন । কোন্ দিক দিয়া সময় যাইতেছে হ’ল নাই ।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতে লাগিল । সকলেই কিছু কিছু
কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন । আনন্দের হাট । কেশব মুড়ি
আয়োজন ক’রে এনেছিলেন । এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে, বিজয় ও
কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন । তখন ঠাকুর যেন দুইজন
অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন । ‘সর্বভূতহিতৈষী’ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) । ওগো ! এই বিজয় এসেছেন । তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেমন শিবরামের যুদ্ধ । (হাস্য ।) রামের গুরু শিব । যুদ্ধও হোলে ; ছুজনে ভাবও হোলো ! কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না ! (উচ্চ হাস্য ।)

“আপনার লোক । তা একরূপ হ’য়ে থাকে । লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রেছিলেন । আবার জানো মায়ে বিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে । যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা । কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয় । তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে ; আবার ওরও একটি দরকার । (সকলের হাস্য ।)

“তবে এ সব চাই । যদি বলা ভগবান্ নিজের লীলা ক’রেছেন, সেখানে জটীলে কুটীলের কি দরকার ? জটীলে কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না । (সকলের হাস্য) । জটীলে কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না । (উচ্চ হাস্য) ।

“রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী । শেষে ছুজনে অমিল । গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন ক’রতে লাগল । একরূপ হয়েই থাকে, যাই হোক, তবু আপনার লোক ।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

পিতাহি লোকস্য চরাচরস্য, হমস্য পূজ্যন্ত গুরুগরীয়ান্ ।

ন স্বৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্তো লোকত্রেয়ংপাপ্রতিমপ্রভাব । গীতা, ১১, ৪৩ ।

[গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ ।]

সকলে আনন্দ করিতেছেন । ঠাকুর কেশবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় ।

“মাছুষগুলি দেখতে সব এক রকম । কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি । কারুর ভিতর সন্ধ্যা বেলী, কারুর রজো গুণ বেলী, কারুর তমোগুণ । পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম । কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর । (সকলের হাস্য) ।

“আমার কি ভাব জানো ? আমি খাই দাই থাকি, আর সব যা জানে । আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে । গুরু, কর্তা আর বাবা ।

“গুরু এক সচ্চিদানন্দ । তিনিই শিক্ষা দিবেন । আমার

সন্তান ভাব । মানুষ গুরু মেনে লাখ লাখ । সকলেই গুরু হ'তে চায় । শিষ্য কে হ'তে চায় ?

“লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন । যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তা'হলে হ'তে পারে । নারদ শুকদেবাদের আদেশ হ'য়েছিল । শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল । আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে ? কল্কাতার হুজুগ তো জানো ! যতক্ষণ কাঠে জাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে । কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই । কল্কাতার লোক হুজুগে ! এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে । বলে জল চাই । সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে ! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ ক'রলে । সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে ! আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো ! এই রকম !

“আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না । তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন । তখন আদেশ হ'তে পারে । সে কথার জোর কত ? পক্ষত টলে যায় । শুধু লেকচার ? দিন কতক লোক শুনবে, তার পর ভুলে যাবে । সে কথার অনুসারে কাজ করবে না ।

“ও দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে । পুকুরের পাড়ে রোজ সকাল বেলা লোকে বাছে করে রাখতো । যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব খালাগাল দেয় । কিন্তু আবার তার পর দিন সেইরূপ । বাছে আর খামে না । (সকলের হাস্য) । তখন লোকে কোম্পানিকে জানালে । তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে । সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, ‘বাছে করিও না’, তখন সব বন্ধ হলো । (হাস্য) ।

“যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস চাই । না হলে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে । আপনারই হয় না আবার অন্য লোক ! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে ! (হাস্য) । হিতে বিপরীত হয় । ভগবান লাভ হ'লে অসুদৃষ্টি হয়, তবেই কার কি রোগ বোঝা যায় । উপদেশ দেওয়া যায় ।

“আদেশ না থাকিলে ‘আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি’ এই অহঙ্কার হয় । অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে । অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা ।* ‘ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু ক'রুছি না’, এ বোধ হ'লে তো সে জীবমুক্ত । ‘আমি কর্তা’ ‘আমি কর্তা, এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি ।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তোহ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্রোক্তি পুরুষঃ ॥ গীতা । ৩, ১৯ ।

[কৰ্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) । তোমরা বলো, ‘জগতের উপকার’ করা । জগৎ কি এতটুকু গা ! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে ? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো । তাঁকে লাভ করো । তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত ক’রতে পারে । নচেৎ নয় ।

একজন ভক্ত । যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কৰ্ম্মত্যাগ করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; কৰ্ম্মত্যাগ করবে কেন ? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান নিত্য কৰ্ম্ম এ সব ক’রতে হবে ।

ব্রাহ্মভক্ত । সংসারের কৰ্ম্ম ? বিষয় কৰ্ম্ম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তাও ক’রবে, সংসার যাত্রার জন্য যে টুকু দরকার । কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক’রতে হবে, যাতে ঐ কৰ্ম্মগুলি নিকামভাবে করা যায় । আর ব’লবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কৰ্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে বেশী কৰ্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই । মনে করছি নিকাম কৰ্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হ’য়ে পড়ে । হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক’রতে গিয়ে লোকমান্য হ’তে ইচ্ছা হ’য়ে পড়ে !

“শত্ৰু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্কর্ণীর কথা বলেছিল । আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিকাম হ’য়ে ক’রতে হয় । ইচ্ছা ক’রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয় ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয় । কালীঘাটে দানই কর্তে লাগলো ; কালীদর্শন আর হ’লো না ! (হাস্ত ।) আগে ঘোঁসো ক’রে ধাক্কা ধুকি খেয়েও কালী দর্শন কর্তে হয়, তার পর দান যত করো, আর না করো । ইচ্ছা হয় খুব করো । ঈশ্বর লাভের জন্যই কৰ্ম্ম । শত্ৰুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি ব’লবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারি করে দাও ? (হাস্ত ।) ভক্ত কখনও তা বলে না । বরং বলবে ‘ঠাকুর ! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও ।’

“কর্মযোগ বড় কঠিন । শাস্ত্রে যে কর্ম করতে ব’লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন । অন্নগতপ্রাণ । বেশী কর্ম চলে না । জর হ’লে কবিরাজী চিকিৎসা ক’রতে গেলে এদিকে রোগীর হ’য়ে যায় । বেশী দেরী নয় না । এখন ডি, গুপ্ত । কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা । ভক্তিশ্রোমণি সুগমশ্রী । (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য ! তোমাদের ভাবটা বেশ । বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বোঝো না । ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত । তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বোঝো এও বেশ ! তোমরা ভক্ত । ব্যাকুল হ’য়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সুরেন্দ্রের বাড়ী ।

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল । সকলে নামিবার উত্তোগ করিতে লাগিলেন । ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষ কোমুদীর লীলাভূমী হইয়াছে ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর, মাষ্টার ও দু’একটি ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন । কেশবের ভ্রাতৃপুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন ।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি কৈ ?— অর্থাৎ কেশব কৈ ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত । মুখে হাসি । আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এ’র সঙ্গে যাবে ? সকলে গাড়ীতে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । ঠাকুরও সম্মেহে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন ।

গাড়ী চলিতে লাগিল । ইংরেজটোলা । সুন্দর রাজপথ । পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা । পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে ; অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে । দ্বারদেশে বাম্পীয় দীপ—কক্ষমধ্যে দীপমালা—স্থানে স্থানে হার্মোনিয়ম, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে । ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন । হঠাৎ বন্ধন ‘আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে ; কি হবে ?’ কি করা যায় ! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের

(India Club) নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন গ্লাসটি ধোয়া তো? নন্দলাল বল্লেন হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোক জন, গাড়ী ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়া স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়ীতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন।

বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বল্লেন, ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেন।

ওরা কি জানেনা, ওদের ভাতাবুড়া যায় আসে। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এদিকে বাড়ীর লোকেরা ছুতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেজেতে চাদর পাতা, দু'চারটা তাকিয়া তার উপর; কক্ষ প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ বস্ত্রে প্রস্তুত ছবি (Oil painting); যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল তিনি বল্লেন “আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে ক’রে বেড়াতে গি’ছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল। মাষ্টারকে নির্দেশ করিয়া বল্লেন, একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায় ঝিয়ে মজলবার, আর জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না; এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?” মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেন্দ্র কিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে বাইবেন, আর দেবী করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাহিত স্ব স্ব বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

— ॐ —
তৃতীয় খণ্ড ।
— ॐ —

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ এভুতি
ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ ।

28th, OCTOBER, 1882.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[উৎসবমন্দিরে ।]

প্রায় বিংশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার ।

অশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি । আজ এখানে মহোৎসব । ব্রাহ্মসমাজের
বাৎসরিক । তাই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ । বেলা ৩টা, ৪টার
সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন । এই
উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে । ব্রাহ্মসমাজকে তিনি
বড় ভালবাসেন ! ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি প্রদা করেন ।
ইহার পূর্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে শিষ্য
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে, কালীবাটী হইতে কলিকাতা
পর্যন্ত ভক্ত সঙ্গে সীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন ।

সিঁতি গাইকপাড়ার নিকট । কলিকাতা হইতে দেড় কোশ উত্তরে ।

উদ্যানবাটীটা মনোহর বলিয়াছি ! স্থানটা অতি নিভৃত । ভগবানের
উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব

করিয়া থাকেন । একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে । এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন । তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন । আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন । বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকারী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সঙ্কীৰ্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন ।

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোকসমাকীর্ণ হইয়াছে । কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট । কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধুসমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন । অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূৰ্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন । উজানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান । প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে । চতুর্দিক আনন্দপরিপূর্ণ । শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে । উজানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে । আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে—

“আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—

ভগবৎ মঙ্গল কিরণে !

সকলেই যেন ভগবদর্শন-পিপাসু । এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল ।

সকলেই গাত্ৰোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন । তিনি আসিয়াছেন ! চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল ।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে । সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ । সম্মুখে দালান, সেখানে প্রভু পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক । আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—সে ঘরেও লোক,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান । দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত । সেই সোপানও লোকে, লোকাকীর্ণ ; সোপানের অনতিদূরে ২৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে

কয়েকখানি কাষ্ঠাসন । তথা হইতেও লোকে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহা-
পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে
পথ । বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে ছলিতেছে— যেন আনন্দভরে মস্তক
অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন । এখন সব
চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল । যতক্ষণ নাট্য-
শালায় অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে,
কেহ বিষয়-কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ
করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে । কিন্তু যাই
ড্রপ সিন (Drop-scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ
করিয়া অনন্তমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে । অথবা নানাপুষ্প-
পরিভ্রমণকারী ষট্-পদবৃন্দ পদের সন্ধান পাইলে অগ্র কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্ম-
মধু পান করিতে ছুটিয়া আসে ।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ গীতা, ১৪, ২৬ ।

[ভক্তসম্ভাষণে]

সহস্র বদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন, “এই যে শিবনাথ ! দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে
আমার বড় আনন্দ হয় । গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে
দেখলে ভারী খুসী হয় । হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে । (শিব-
নাথের ও সকলের হাস্য) ।

[সংসারী-লোকের স্বভাব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, “তোমরা
একটু ঐখানে গিয়ে বস ।” অথবা বলি, ‘যাও বেশ বিল্ডিং (Building)
দেখগে’ (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাড়ীর মন্দির সকল) । (সকলের হাস্য) ।

“আবার দেখছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে । তাদের ভারি
বিষয়-বুদ্ধি । তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না । ওরা হয় ত আমার

সঙ্গে অনেকগ ধরে ঈশ্বরীয় কথা কহিছে । এদিকে এরা আর ব'লে থাকতে পারে না, ছটকট্ ক'রছে । বার বার তাদের কাণে কাণে কিস্ কিস্ ক'রে বলছে, 'কখন যাবে,—কখন যাবে ।' তারা হয় ত ব'লে 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব' । তখন এরা বিরক্ত হ'য়ে বলে 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নোকার গিয়া বসি' । (সকলের হান্ত) ।

“সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ভ্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদগঞ্জে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না । তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—‘মাগুর মাছের কোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল ।’ প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরি বোল ব'লতে যেতো । হরিনামস্থধার একটু আশ্বাদ পেলে তারা বুঝতে পারতো যে, ‘মাগুর মাছের কোল, আর কিছুই নয়, কেবল হরি প্রেমে যে অক্ষ পড়ে তাই ; আর ‘যুবতী মেয়ে’ কিনা—পৃথিবী । ‘যুবতী মেয়ের কোল’ কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি ।

[নাম-মাহাত্ম্য ।]

নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন । চৈতন্যদের ব'লেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য । শীঘ্র ফল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে । যেমন কেউ বাড়ীর কাণিসের উপর বীজ রেখে দিয়েছিল ; অনেক দিন পরে বাড়ী ভুমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে প'ড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল ।

[মহত্ত্বপ্রকৃতি ও গুণত্রয় ;—ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে ।

“সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান ? বাড়ীটা এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা—যেরামত করে না । ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হাগুচ্ছে—উঠানে এখানে সেওলা প'ড়েছে ; ওখানে সেওলা প'ড়েছে হ'স নাই । আসবাবগুলো পুর্বানো, কিছু কাই কদ্বার চেষ্টা নাই । কাপড় যা তাই, একখানা হ'লেই হ'লো । লোকটা খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক ; কারও কোনও অনিষ্ট করে না ।

“সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে । ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটি । বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্ কাট্ । দেওয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি । বাড়ীটা চপকাই করা

যেন কোনখানে একটু দাগ নাই । নানা রকমের ভাল পোষাক । চাকরদেরও পোষাক । এমনি এমনি সব ।

“সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব ।

“আর ভক্তির সত্ত্ব আছে । যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে । সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে এত দেরী হচ্ছে । এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত ; শাকার পেলোই হ’ল । খাবার ঘট নাই । পোষাকের আড়ম্বর নাই । বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই । আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক’রে ধন লয় না ।

‘ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, কুন্দাক্ষের মালা আছে । সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটা সোণার দানা (সকলের হস্ত) । যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় পরে পূজা করে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ক্লেব্যং মাস্ত্র গমঃ পার্থ নৈতং ত্ৰয়্যাপপত্ততে ।

ক্লদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ গীতা, ২।৩

ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলন্ত । ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে । যেন ভাকতি ক’রে ধন কেড়ে লওয়া । ‘মারো কারো বাঁধো’ । এইরূপ ভাকাত-পড়া ভাব ।

ঠাকুর তাঁহার প্রেমরসাবিষ্কৃতকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিতে লাগিলেন :—

গঙ্গা গঙ্গা প্রভাসাদি কালী কালী কেনা চায় ।

কালী কালী ব’লে আমার অঙ্গপা যদি ফুরায় ॥

ত্রিসঙ্ক্যা যে বলে কালী, পূজা সঙ্ক্যা সেকি চায় ।

সঙ্ক্যা তার সঙ্কানে ফেরে কতু সঙ্কি নাহি পায় ॥

দান ত্রত বজ্র আদি আর কিছু না মনে লয় ।

মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্ময্যীর রাজ্য পায় ॥

কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায় ।

দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥

ঠাকুর ভাবোন্নত, যেন অগ্রিময়ে দীক্ষিত হইয়া গাহিলেন !

[নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ ।]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি ।

আধেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥ (২৫ পৃষ্ঠা ।)

“কি ! আমি তাঁর নাম ক’রেছি—আমার আবার পাপ ! আমি তাঁর ছেলে ! তাঁর ঐশ্ব্যের অধিকারী !” এমন রোক হওয়া চাই !

“তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয় । তাঁর কাছে জোর কর ; তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক !

“আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায় । বৈজ্ঞ তিন প্রকার ;—উত্তম বৈজ্ঞ, মধ্যম বৈজ্ঞ, অধম বৈজ্ঞ ! যে বৈজ্ঞ এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে,’ এই কথা ব’লে চ’লে যায়, সে অধম বৈজ্ঞ—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না । যে বৈজ্ঞ রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক’রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে ! লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও’—সে মধ্যম বৈজ্ঞ । আর যে বৈজ্ঞ, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক’রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈজ্ঞ । এইটী বৈজ্ঞের তমোগুণ, এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না ।

[তিন আচার্য্য ।]

“বৈজ্ঞের মত আচার্য্যও তিন প্রকার । যে ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না ; সে আচার্য্য অধম । যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বারবার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য । আর যখন শিষ্যরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পন্থায় করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

“যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”। উপনিষৎ।

[ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না।]

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার।

ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ’য়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটি জিনিষ, জগৎ একটি জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ‘ব্যক্তি (Personal God)’ হ’য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক’রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, ‘আমিও মিথ্যা, জগতও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।’ জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।

“কি রকম জ্ঞান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভাঁড়-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ’য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধ’রে থাকেন। জ্ঞান সূর্য্য উঠলে, সে বরফ গ’লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব’লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব’লবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই, তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না।

“বিচার করতে করতে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরুখোসা ছাড়ালে, এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

“যেখানে নিজের ‘আমি’ খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব’লবে। একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গি’ছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গ’লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

“পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ’লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ’লে এক হ’য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

“বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় ক’রে তর্ক করে।

শেষ হ'লে, চূর্ণ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

“আগেকার লোকে বলতো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

[‘আমি’ কিন্তু যায় না।]

“আমি’ ম’লে ঘুচিবে জঞ্জাল” (সকলের হাত)। কিন্তু হাজার বিচার কর, ‘আমি’ যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে ‘ভক্ত আমি’ এ অভিমান ভাল।

“ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হ’য়ে, রূপ হ’য়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনে। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও; তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব’লে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি। ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোহর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পর ॥ গীতা, ১১, ৫৪ ।

[ঈশ্বর দর্শন । সাকার না নিরাকার ।]

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?’

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন ক’রে?

ব্রাহ্মভক্ত । কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হ’য়ে তাঁর জন্ত কাঁদতে পারি? লোকে ছেলের জন্ত, স্ত্রীর জন্ত, টাকার জন্ত, এক খটা কাঁদে! কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রাগা বাগা বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি-ফেলে চীৎকার ক’রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে ছড়-ছড় ক’রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানামত কেন? কেউ

বলে, সাকার, কেউ বলে, নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা-রূপের কথা শুনিতে পাই। এত গুণগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেক্রপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গুণগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করিতে পারা যায়, তাহ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন ক'রে?

“একটা গল্প শুন। একজন বাহে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে ব'লে—দেখ, অমুক গাছে একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটা উত্তর করলে, ‘আমি যখন বাহে গিছিলাম আমিও দেখিছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ!’ আর একজন ব'লে, ‘না না—আমি দেখেছি; হলদে।’ এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'লে, ‘না জবুদা, বেগুনী, নীল’ ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব'লে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি—জোমরা যা যা ব'লছে, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়! আবার কখনও দেখি, কোনও রঙ নাই!’

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সন্তোষ আবার তিনি নিঃশব্দ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্ত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।”

“কবীর ব'লতো, ‘নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।’

“ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-বংশল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা। ‘অনন্ত’কে—জানা।]

“বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ, টুপ, উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্রে দেখলে ভক্তের ‘আমি’ অভিমান,

ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চোদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও—তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কাল-বর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

“তাই ব'লছি, বেদান্তবিচারে ব্রহ্ম নিগূর্ণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা-রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

[অনন্তকে জানা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্ভাগ্য মানুষজনই পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

“যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার? আমি আধ্‌ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

যস্যাত্মরতিরেব শ্রাদ্ধাত্মতৃপ্তস্ত মানবঃ ।

আত্মাত্মেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ গীতা, ৩, ১৭ ।

[ঈশ্বরলাভের লক্ষণ । সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান ।]

“বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির—কামিনীকাঞ্ছনে আসক্তির—লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নশ্বর।

“এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিপ্স, গুহ ও নাভি মনের স্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্ছনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ

দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হ'য়ে বলে 'একি !' 'একি !' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

“মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিজ্ঞা অজ্ঞান সব গিয়ে ঐশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সে ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে যায়।

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরূপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, ছুঁলাম কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

“শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁস, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তম ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

“এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তি-পথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি ও কর্মত্যাগ।]

“আমায় একজন ব'লেছিল, মহাশয় ! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন ? (সকলের হাস্য)।

“সমাধি হ'লে সব কর্মত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম, বিষয়কর্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈঁচৈ থাকে। যত ঐশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম-গুণ গান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, তোমার নাম, গুণ, কথা, অনেক হ'য়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন'। তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।]

“আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়া জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হৃদয়কে কাদতে কাদতে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, দাদা, একি হ'ল ! হৃদয় ব'লে, একে গলিত হস্ত বলে। ঐশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।

“সদীর্ঘনে প্রথমে, ‘নিতাই আমার মাতাহাতী’—‘নিতাই আমার মাতাহাতী’ । ভাব গাঢ় হ’লে শুধু বলে, ‘হাতী হাতী’ । তার পর কেবল ‘হাতী’ এই কথাটি মুখে থাকে । শেষে ‘হা’ বলতে বলতে ভাব-সমাধি হয় । তখন সে ব্যক্তি এককণ কীর্তন ক’রছিল, চূপ হ’য়ে যায় ।

“যেমন ব্রাহ্মণভোজন প্রথমে খুব হৈ চৈ । যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক’রে ব’সল, তখন অনেক হৈ চৈ ক’মে গেল, কেবল ‘লুচি আন’, ‘লুচি আন’ শব্দ হ’তে থাকে । তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে । যখন দই এল, তখন সুপ্, সুপ্ (সকলের হাস্ত) —শব্দ নাই ব’ললেও হয় । খাবার পর নিদ্রা । তখন সব চূপ ।

“তাই ব’লছি, প্রথম প্রথম কন্মের খুব হৈ চৈ থাকে । ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কন্ম কমবে । শেষে কন্মত্যাগ আর সমাপ্তি ।

“গৃহস্থের বৌ অন্তসত্তা হ’লে শাশুড়ী কন্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কন্ম প্রায় ক’রতে হয় না । ছেলে হ’লে একেবারে কন্মত্যাগ । মা ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে । ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে ।

[ঈশ্বরলাভ ও লোকশিক্ষা প্রদান ।]

“সমাধি হ’বার পর প্রায় শরীর থাকে না । কা’ক কা’ক লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির । আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের । কৃপ খোঁড়া হ’য়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় ক’রে দেয় । কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয় । এরূপ মহাপুরুষ জীবের চুঃখে কাতর । এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হ’লেই হ’ল । স্বার্থপর লোকের কথা তো জান । এখানে মোৎ ব’লে মুৎবে না, পাছে ভোমার উপকার হয় (সকলের হাস্ত) । এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয় (সকলের হাস্ত) ।

“কিন্তু শক্তিবিশেষ । সামান্য অধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে । হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম ক’রে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে ব’সলে ডুবে যায় । কিন্তু নারদাদি বাহাদুরি কাঠ । এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

ভদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ গীতা, ১১, ৪৫।

[ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা ব'লেছিলাম। এক দিন তারা সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গি'ছিল। আমি ব'ল্লুম, তোমরা কি রকম lecture দাও, আমি শুনবো। তা' গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব ব'লতে লাগল। বেশ বলে; আমার, ভাব হ'য়ে গি'ছিল। পরে কেশবকে আমি ব'ল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—‘হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ,’ এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালব... , তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা ক'রতে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ব'লতে লাগল, ‘ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা ক'রতে পারলে না!’ আমি সেজ বাবুকে ব'ললাম, ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্ব্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই তারি একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা! হি! অমন হীনবুদ্ধির কথা ব'লতে নাই, কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?’ তাই বলি যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাহাকেই লোকে চায়; তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার কটা ভাই, এ সব কথা এক দিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আর কি!

আবার সেই গুরুকনিদিত কল্লোরে মধুরিমা পূর্ণ গঙ্গা।

ডুব, ডুব, ডুব, রূপ সাগরে আমায় মন।

ভলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ॥

খুঁজ, খুঁজ, খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।

দীপ, দীপ, দীপ জ্ঞানের বাতি জলবে হৃদে অজস্র ॥

কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

(শিবনাথের প্রতি) “তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে । শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব ? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব’লে বোধ হয় ।

[জন্মান্তর । *]

এক জন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মহাশয় ! আপনি জন্মান্তর মানেন ?
শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, আমি শুনেছি, জন্মান্তর আছে । ঈশ্বরের কার্য্য আমরা
কল্পবুদ্ধিতে কি বুঝবো ? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি
না । ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ ক'রবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে । তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল
পড়ছে । অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব'লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য ! পিতামহ, যিনি
স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেপ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবস্ত্রর এক বস্ত্র, তিনিও
দেহত্যাগের সময় মায়াতে কঁাদচেন ! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে
তিনি বল্লেন, “কৃষ্ণ ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্ম কঁাদচি না । যখন ভাবছি
যে, যে পাণ্ডবদে, স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী, তাদেরও ছুঃখের, বিপদের,
শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কঁাদুচি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে
পারলাম না ।”

[କୀର୍ତ୍ତନାନନ୍ଦେ—ଭକ୍ତମତ୍ତେ ।]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উজ্জানের বৃক্ষরাজি লতা পল্লব শরচ্ছত্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল।

* বহুনি যে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তব চার্জ্জন ।

তানুহংবেদ সর্বাণি ন দ্রঃ বেথ গরস্তপ । পীতা, ৭, ৫ ।

এদিকে সমাজগৃহে সঙ্গীর্জন আরম্ভ হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন । সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন । হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল । চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উত্তানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল ?

কীৰ্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ট হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ভাগবতভক্তভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম ।”

বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের প্রতি
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ।

14th DECEMBER, 1882.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিহ্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ গীতা, ২, ২০ ।

[শরীরত্যাগ না আত্মহত্যা ?]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন । সঙ্গে তিন চারিটা ব্রাহ্মভক্ত । অগ্রহায়ণ, শুক্লা-চতুর্থী তিথি । বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ । পরম-হংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত তাঁহার নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন । রবিবারেই বেশী লোকসমাগম হয় । সে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহার প্রায় অন্য দিনেই আসেন ।

পরমহংসদেব তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট । বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাশ্র হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাড়রের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন । ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছিল । শীতকালের স্থিরা, স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী । দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পো-দ্যান, তার পর পোস্তা । পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুষ্পসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন ।

শীতকাল, তাই সকলেব গায়ে গরম কাপড় । বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান, তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন ;—ঔষধ সেবনের সময় হইলে থাইবেন । বিজয় এখন সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য, সমাজের বেদীৰ উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয় । এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে । কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন—স্বাধীন ভাবে কথাবার্তা বা কাব্য করিতে পারেন না । বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিয়াছেন, ভক্তিব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন । তিনি ভগবানকে হৃদিপাশে ধরিয়া প্রবান পাষদ—হবিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এতটুকু হইতেন যে, নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত । বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন, কিন্তু মহাভক্ত পূৰ্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল, শরীরমধ্যস্থিত হবিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে । তাই তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্ভাগ হরিপ্রেমে ‘গর্গর মাতোয়ারা’ অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন । মস্তমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা বিকিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পবমহৎসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন । আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের স্তায় নৃত্য কবিত্তে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন ।

একটা ছোকরা এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় স্কুর দিয়া শবাব ত্যাগ করিয়াছেন । আজ প্রথমে তাঁহাবই কথা হইতেছিল । ছোকরাটির নাম বিষ্ণু ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদেব প্রতি) । দেখ, এই ছেলেটা শরীর ত্যাগ ক’বেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হ’য়ে র’য়েছে । এখানে আসতো, স্কুলে প’ড়তো, কিন্তু বলতো সংসার ভাল লাগে না । পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীযেব কাছে কিছুদিন ছিল—সেখানে নির্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে, সৰ্বদা ব’সে ধ্যান ক’রতো । ব’লেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কবি ।

“বোধ হয়—শেষ জন্ম । পূৰ্ব্ব জন্মে অনেক কাজ করা ছিল । একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবাব হ’য়ে গেল ।

“পূৰ্ব্বজন্মের সংস্কার মান্তে হয় । শুনেছি—একজন শব সাধন ক’রুছিল,

গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করুছিল। কিন্তু সে অনেক বিজীমিকা দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাবে নিয়ে গেল। আর এক জন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অস্ত্রাস্ত্র পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু ভয় ক'রতে ক'রতে মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ল্লেন—আমি তোমার উপর প্রণয় হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' সে মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে বল্লেন—‘মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়েছি! সে ব্যক্তি, এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে তোমার সাধন করুছিল, তাকে তোমার দয়া হলো না! আর আমি, কিছু জানিনা, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, স্মৃতিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'লো!’ ভগবতী হাসতে হাসতে ব'ল্লেন,—‘বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্বী করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার একরূপ খোঁটপাট হ'য়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?’

[মুক্তপুরুষ ও শরীর ত্যাগ।]

এক জন ভক্ত। আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে ভয় হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করুতে হবে।

‘তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পার, আর ভেঙ্গে ফেলতেও পার।

‘অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটা ছোকরা আসতো—উমের কুড়ি বছর হ'বে। গোপাল সেন। যখন এখানে আসতো, তখন এত ভাব হ'তো, যে হৃদয়কে ধ'রতে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্লেন—আর আমি আসতে পারবো না—তবে আমি চ'ল্লুম। কিছু দিন পরে শুন্লুম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অনিত্যমস্থং লোকমিমং প্রাপ্য ভজয়ামাসু । গীতা ৯, ৩৩ ।

[মুক্তির ব্যাঘাত—কামিনীকাঞ্চন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । “জীব চার থাক ব'লেছে—(১) বদ্ধজীব, (২) মুমুকুজীব, (৩) মুক্তজীব, (৪) নিত্যজীব ।

“সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যার মায়া এই সংসার) তিনি জেলে । জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পলাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে । এদের মুমুকুজীব বলা যায় । যারা পলাবার চেষ্টা ক'রছে, তারা সকলেই পলাতে পারে না । দু'চারটা মাছ ধপাঙ, শব্দ ক'রে পলায় । তখন লোকেরা বলে,—ঐ ‘মাছটা বড় পালিয়ে গেল !’ এই দু'চারটা লোক—মুক্তজীব । কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না । নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না । কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে ম'রুতে হবে । তারা জালে প'ড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে । পলাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে । এরাই বদ্ধজীব । জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে—আমরা হেথায় বেশ আছি । বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে—আসক্ত হ'য়ে আছে ; কলহ-সাগরে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে ; কিন্তু মনে করে যে বেশ আছি । যারা মুমুকু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয় ; ভাল লাগে না । তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান্ লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে । কিন্তু সে বকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা ।

[বদ্ধজীবের লক্ষণ ।]

“বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হ'ল আর হয় না । এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না ।

“উট কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে । কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত বহু-বহু ক'রে পড়ে ; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না ! সংসারী-লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি । শ্রী য'য়ে গেল—কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'রবে ! ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিছু দিন পরেই সব ভুলে গেল ! সেই ছেলের মা, যে শোকে

অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পবুলো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

“আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেল। হয়। গিলতেও পারে না আবার উগুরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝছে যে সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

“কেশব সেনের একজন আত্মীয়—পঞ্চাশ বছর বয়স—দেখি তাস্ খেলছে! যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই!

“বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ কুণ্ড পুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তা হ'লে ম'রে যাবে। (সকলে শুক)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ গীতা, ৬, ৩৫ ।

[তীত্রবৈরাগ্য ।]

বিজয় । বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের কৃপায় তীত্রবৈরাগ্য হ'লে এই কামিনীকাকনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীত্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক; এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীত্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্ত ব্যাকুল; যার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্ত ব্যাকুল। যার তীত্র বৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, কাছ থেকে পলাতে ইচ্ছা হয়; আর পলায়ও। ‘বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো,’ একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক!

“তীব্রবৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোনো । এক দেশে অনাবৃষ্টি হ’য়েছে । চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে ! এক জন চাষার খুব রোক আছে ; সে এক দিন প্রতিজ্ঞা ক’রুলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে । এ দিকে স্নান করবার বেলা হ’লো । গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল । মেয়ে বললে— ‘বাবা ! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল ।’ সে ব’লে ‘তুই যা, আমার এখন কাজ আছে ।’ বেলা দুই প্রহর একটা হ’লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক’চ্ছে । স্নান করার নামটী নাই । তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব’লে, ‘এখনও নাও নাই কেন ? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি ! না হয় কাল ক’রবে, কি খেয়ে দেয়েই ক’রবে !’ গালাগালি দিয়ে চাষা, কোদাল হাতে ক’রে তাকে তাড়া কলে ; আর বললে, ‘তোরা আকৈল নাই ? বৃষ্টি হয় নাই ! চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে ? না খেয়ে সব মারা যাবি ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো ।’ স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল । চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক’রে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক’রে দিল । তখন একধারে ব’সে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল্কুল্ ক’রে আসছে । তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হ’লো । বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে ব’লে ‘নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ ।’ তার পর নিশ্চিন্ত হ’য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস ভোঁস ক’রে নিদ্রা যেতে লাগলো ! এই রোক তীব্র বৈরাগ্যের উপমা ।

“আর একজন চাষা,—সেও মাঠে জল আনছিল । তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, ‘অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই ;’ তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না ক’রে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব’লে—‘তুই যখন বল্‌ছিস তা চল্’ (সকলের হাস্য) । সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ’লো না ! এটা মন্দ বৈরাগ্যের উপমা । খুব রোক না হ’লে, চাষার ঘেমন মাঠে জল আসেনা, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সৰ্ব্বৈ স শান্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ গীতা, ২, ৭০ ।

[দাসত্ব ও 'কামিনী' ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । আগে অত আসতে ; এখন আস না কেন ?
বিজয় । এখানে আসবার খুব ইচ্ছা ; কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সমাজের
কাজ স্বীকার ক'রেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বন্ধ করে, জীবের
স্বাধীনতা যায় । কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার । তার জন্ত পরের
দাসত্ব ক'রতে হয় । স্বাধীনতা চ'লে যায় । তোমার মনের মত কাজ ক'রতে
পার না ।

‘জয়পুরে গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই । তখন
খুব তেজস্বী ছিল । রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই ।
ব'লেছিল—‘রাজাকে আসতে বল ।’ তারপর রাজা ও পাঁচজনে, তাদের বিয়ে
দিয়ে দিলেন । তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত, আর কাহারও
ডাকতে হলো না । নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত । ‘মহারাজ, আশীর্বাদ
করুতে এসেছি, এই নির্দোষ এনেছি, ধারণ করুন ।’ কাছে কাছেই আসতে
হয় ; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে বড়ি,
এই সব ।

‘বারশো গাড়া আর তেরশো নেড়ী তার দাকী উদম, সাঁড়ী’ এ গল্পতো
জান । নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো গাড়া শিষ্য ছিল ।
তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো । তিনি—ভাবতে
লাগলেন, ‘এরা সিদ্ধ হ'লো ; লোককে যা বলবে তাই ফলবে ; যে দিক দিয়ে
যাবে, সেই দিকেই ভয় ; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে,
তাদের অনিষ্ট হবে ।’ এই ভেবে বীরভদ্র তাদের ডেকে বলেন,—তোমরা
গলায় গিরে সন্ধ্যা আঁছিক ক'রে এস । গাড়াঘের এত তেজ যে, ধ্যান ক'রতে
ক'রতে সন্ধ্যা হ'লো । কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে, হ'স
নাই । আবার ভাঁটা প'ড়ছে তবু ধ্যান ভাঙে না । তেরশোর মধ্যে একশো

বুঝেছিল—বীরভদ্র কি ব'লবেন । গুরুর বাক্য লঙ্ঘন ক'রতে নাই, তাই তারা স'রে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা ক'লেন না । বাকী বারশো দেখা ক'রলে । বীরভদ্র ব'লেন, এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'রবে । তোমরা এদের বিয়ে কর ।' ওরা ব'লে, 'যে আজ্ঞা ; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে ।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগলো । তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্তার বল নাই । মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকতে আর সে বল রইল না ; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায় । (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখছো, পরের কর্ম স্বীকার ক'রে কি হ'য়ে র'য়েছে ! আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত, সাহেবের চাকরী স্বীকার ক'রে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায় । এর কারণ কেবল “কামিনী” । বিয়ে ক'রে নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোলবার যো নাই ! তাই এত অপমান বোধ । অত দাসত্বের যন্ত্রনা !

(ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকাঞ্চন ।)

“যদি একবার এইরূপ তীব্রবৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, ঘরে থাকলেও মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না তাদের ভয় থাকে না । যদি একটা চুমুক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা'হলে লোহাকে কোন্টা টেনে লবে ? বড়টাই টেনে লবে । ঈশ্বর বড়চুমুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুমুক পাথর ! কামিনী কি করবে ?

একজন ভক্ত । মহাশয় ! মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা ক'রবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তিনি কামিনীকে আর অঁগ চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে । তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[গুরু কে ? আদেশ-বাদ ও অধিকারী নির্ণয় ।]

বিজয় । ব্রাহ্মসমাজের কাজ ক'রতে হয়, তাই সদা সর্বদা আসতে পারি না ; সুবিধা হ'লে আসবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । দেখ, আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না ।

“যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না । সে উপদেশের কোন শক্তি নাই । আগে সাধন ক'রে, বা যে কোনরূপে হোক, ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয় । তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার দিতে হয় ।

“ও দেশে একটি পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর । তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে ক'রে রাখতো । সকালে যারা ঘাটে আসতো, তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'রতো । গালাগালে কোন কাজ হ'তো না—আবার তার পরদিন পাড়েতেই বাহ্যে ! শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিস টাঙ্গিয়ে দিলে যে, ‘এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'রতে পারবে না ; যদি করে, শাস্তি হবে ।’ এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে ক'রতে না ।

“তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও লেকচার (Lecture) দেওয়া যায় । যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায় । তখন এই কঠিন আচার্য্যের কৰ্ম ক'রতে পারে ।

“একজন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল । তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে । হয় তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছন থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে । মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ ক'রতে পারে না ।

বিজয় । মহাশয় ! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিজ্ঞান হয় না ?

[সচ্চিদানন্দগুরু ও মুক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে ! যার এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত ক'রতে

পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হই নাই, তাদের কি সাধ্য যে জীবের ভববন্ধন মোচন করে !

“আমি একদিন পঞ্চবটীর* কাছ দিয়ে ঝাউতলার বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনে গেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেয়ে দেখলুম, কি হ’য়েছে। দেখি যে, একটা টোড়ায় ব্যাঙটাকে ধ’রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলিতেও পারছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচ্ছে না। তখন ভাবলাম, ওরে ! যদি জাত সাপে ধ’রতো, তা’হলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চূপ হ’য়ে যেতো ; এ একটা টোড়ায় ধ’রেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

“যদি সদগুরু হয়, তাহ’লে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হ’লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে । গীতা ।

[মুক্তি বা ঈশ্বর লাভের উপায় ।]

বিজয় । মহাশয় ! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ’য়ে আছি ? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ ক’রে রেখেছে। “আমি ম’লে ঘুচিবে জগৎপাল।” যদি ঈশ্বরের কৃপায় ‘আমি অকর্তা’ এই বোধ হ’য়ে গেল, তা হ’লে সে ব্যক্তি তো জীবমুক্ত হয়ে গেল ! তার আর ভয় নাই।

“এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জগৎ সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ স’রে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহ’লে ঈশ্বর দর্শন হয়।

* দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ীর ভিতরে পঞ্চবটী ।

“আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; মধ্যে শ্রীঅরুণিণী
মায়া ব্যবধান আছে ব’লে, লক্ষণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পারেন না !

“এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল ক’রছি।
আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান
সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পা’রছ না।

“জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব
নানা উপাধি হ’য়ে প’ড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

“এক একটা উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে
কাপড় প’রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিখুর টপ্পার তান এসে জোটে ;
আর তান খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick), এই সব এসে
জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস দিতে আরম্ভ
করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মাল্ল-
ঘের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ
টাগজ পেলেই তার উপর ক্যাস্ ক্যাস্ ক’রে টান দিতে থাকবে।

“টাকাও একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ’লেই মানুষ আর এক রকম
হ’য়ে যায় ; আর সে মানুষ থাকে না।

“এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া ক’রতো। সে বাহিরে বেশ বিমণী
ছিল। কিছু দিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হুদে সঙ্গে ছিল। নৌকা
থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব’সে আছে। বোধ হয়,
হাওয়া থাকছিল। আমাদের দেখে ব’ল্লে, ‘কি ঠাকুর ! বলি—আছ কেমন ?’
তার কথার স্বর শুনে আমি হুদেকে বল্লুম, ‘ওরে হুদে ! এ লোকটার টাকা
হয়েছে, তাই এই রকম কথা।’ হুদে হাসতে লাগলো।

“একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ভে টাকাটা ছিল। একটা
হাতী সেই গর্ভ ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে
হাতীকে লাথী দেখাতে লাগল ; আর ব’লে তোর এত বড় লাথি যে আমার
ডিঙ্গিয়ে যাস। টাকার এত অহংকার।

(অহংকার কখন যায় ; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ।)

“জানলাভ হ’লে অহংকার যেতে পারে। জানলাভ হ’লে সমাধিস্থ হয়।
সমাধিস্থ হ’লে তবে অহং যায়। সে জানলাভ বড় কঠিন।

“বেদে আছে যে, সপ্তমকৃমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হলেই

তবে অহং চলে যেতে পারে । মনের সচরাচর বাস কোথায় ? প্রথম তিন ভূমিতে । লিঙ্গ, গুহ, নাভি—সেই তিন ভূমি ; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে ; কামিনী-কাঞ্চে । হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক’রে, বলে, ‘একি ! একি !’ তার পর কষ্ট ; সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও গুণিতে ইচ্ছা হয় । কপালে—ক্রমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপদর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু পারে না, লগ্ননের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না ; ছুই ছুই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না । সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয় ।

বিজয় । সেখানে পৌঁছবার পর, যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মাহুষ কি দেখে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না ।

“জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফিরে না । জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না । সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না ।

“হুনের ছবি সমুদ্র মাপ্তে গিছিল । কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে ! সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক ? যে দিবে, সে মিসে গেছে । সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয় । কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না ।

(বজ্জাং ‘আমি’ ।)

“যে ‘আমি’তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চে আসক্ত করে, সেই ‘আমি’ খারাপ । জীব ও আত্মার প্রভেদ হ’য়েছে, এই আমি মাঝখানে আছে বলে । জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তা’হলে দুটো ভাগ দেখায় ! বস্তুতঃ, এক জল ; লাঠিটার দরুণ দুটো দেখাচ্ছে । ‘অহং’ই এই লাঠি ! লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে ।

“বজ্জাং ‘আমি’ কে ? যে ‘আমি’ বলে—‘আমায়’ জানে না ! আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে ? যদি চোরে দশ টাকা চুরী করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব মারে ; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়াল ডেকে পুলিশে দেয় ও মাদ খাটায় ! ‘বজ্জাং আমি’ বলে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে ! এত বড় আশ্পর্ক !

(‘অহং’ কিন্তু যায় না ।)

বিজয় । যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না,

তা'হলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয় । আর ভক্তিয়োগে যদি অহং থাকে ; তবে জ্ঞান যোগই ভাল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দুই একটা লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না । হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত । আজ অশ্বখ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো, ফেঁকড়ী বেরিয়েছে ।

(দাস 'আমি' !)

“একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে । “হে ঈশ্বর ! তুমি প্রভু, আমি দাস,” এই ভাবে থাকো । ‘আমি দাস’ ‘আমি ভক্ত’, এরূপ ‘আমি’তে দোষ নাই ; মিষ্ট খেলে অস্থল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয় । জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন । দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না । কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি, যায় না । তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগ । ভক্তিপথ সহজ পথ । আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ ক'রবে, কোন সন্দেহ নাই ।

“যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটা রেখা কাটা হ'য়েছে । যেন দুই ভাগ জল ! আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না । ‘দাস আমি’ কি ‘ভক্তের আমি’, কি ‘বালকের আমি’ এরা যেন ‘আমি’র রেখা মাত্র ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তাহি গতিদুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ গীতা, ১২, ৫ ।

[ভক্তিয়োগ ও জ্ঞানযোগ ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । মহাশয় ! আপনি ‘বজ্জাং আমি’ ত্যাগ ক'রতে ব'লছেন । ‘দাস আমি’তে দোষ নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ‘দাস আমি’ অর্থাৎ আমি ‘ঈশ্বরের দাস,’ আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান । এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয় ।

বিজয় । আচ্ছা, যার ‘দাস আমি’ আছে, তার কাম ক্রোধাদি কিরূপ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক ভাব যদি হয়, তা হ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে । যদি ঈশ্বর লাভের পর ‘দাস আমি’ বা ‘ভক্তের আমি’ থাকে,

সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।

“নারকেল গাছের বেলো শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারকেলের বেলো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে; বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন দহ, রক্তঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিষের উপর টান ক'রতেও যতক্ষণ, তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখান পাচ টাকার কাপড় তুমি আধপয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট ক'রে বলবে এখন—‘না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে’। বালকের আবার সকাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতিবিচার নাই। মা ব'লে দিয়েছে ‘ও তোর দাদা হয়,’ সে ছু তোর হ'লেও এক পাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই। পাইখানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না।

(ভক্তিযোগ যুগধর্ম ; জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

“কেউ কেউ সমাধির পরও ‘ভক্তের আমি’, ‘দাস আমি’ নিয়ে থাকে। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’ ‘আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্,’ এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব ‘আমি’ যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

“ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্, মনে ক'রলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’ ‘আমি ছেলে, তুমি মা’ এই অভিমান রাখতে চায়।”

বিজয়। যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তারাও তো তাঁকে পান ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। ভোমায় তো সপ্তভূমির কথা ব'লেছি। সপ্তম-ভূমিতে মন প'ছছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ কেমন ক'রে বোধ হবে ? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। ‘আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ ?’ এ সব বোধ কলিতে

হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো কোন্ খান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বখগাছ এই কেটে দাও, মনে ক'রলে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো, গাছের একটা ফেঁকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহান্তিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল; সহজ।

“আর ‘চিনি হ’তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।’ আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি, ‘আমি ব্রহ্ম’। আমি বলি, ‘তুমি ভগবান্, আমি তোমার দাস’। পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচখেলান ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হ’য়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান ক’রবো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবকভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।

“‘আমিই সেই’ এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।

(দ্বিবিধা ভক্তি ।)

“কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ’লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম অমুরাগ না হ’লে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

“আর এক রকম ভক্তি আছে; তার নাম বৈধী ভক্তি। এতো জপ ক’রতে হবে, উপোস ক’রতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা ক’রতে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক ক’রতে ক’রতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একবারে চ’লে যাবে, আর তাঁর উপর ঘোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

“কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্ম কান্দে। যেমন প্রহ্লাদ। ‘বিধিবাদীয়’ ভক্তি; যেমন, হাওয়া পাবে ব’লে পাখা করা। হাওয়ার জন্ম পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে ব’লে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে

দেয় । ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপ, তপ, কৰ্ম, ভাগ হ'য়ে যায় । হরি প্রেমে মাতোয়ারা হ'লে বৈদীক্য কে ক'র্বে ?

“যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি । তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি ।

(উত্তম অধিকারী ।)

“যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা ক'র্ত্ত পারে না । পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা ক'র্ত্তে পারে । ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি * মাখান থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে, তা র'য়ে যায় । কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ । ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না ।”

[ঈশ্বর দর্শন (God-vision,) উপায় ।]

বিজয় । মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ ক'র্ত্তে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'র্ত্তে গেলে, ভক্তি হ'লেই হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় ; কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি, চাই । সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে । যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা ; শ্রীরামস্বামীর উপর ভালবাসা ।

“এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে শ্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়াব টান থাকে না । দয়া থাকে । এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয় ; একটি কক্ষভূমি মাত্র বোধ হয় । যেমন পাড়াপেঁয়ে বাড়ী কিন্তু কল্কাতা কক্ষভূমি । কল্কাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয়, কক্ষ করবার জ্ঞান । ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে ।

“বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না । দেশলায়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষো, কোন রকমেই জলবে না—কেবল এক রাশ কাঠী লোকমান হয় । বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই ।

“শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীর ! বল্লেন, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না ! তুমি কি প্রলাপ বোচ্চো ? শ্রীমতী বল্লেন, সখি ! অনুরাগ-অঙ্গন চক্ষে মাখো, তা হলে তাঁকে দেখতে পারে ।

(বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই গানে আছে—

* কালি—Solution of Silver.

‘প্রভু বিনে অহুরাগ, করে যজ্ঞযাগ,

তোমাকে কি যায় জানা !’

“এই অহুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হ’লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।”

(ঈশ্বর দর্শন ও কৃপা ।)

বিজয় । ঈশ্বর দর্শন কেমন ক’রে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । চিত্তশুদ্ধি না হ’লে হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হ’য়ে আছে, মনে ময়লা প’ড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুষকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেলে তখন চুষক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। ‘হে ঈশ্বর আর অমন কাজ ক’রো না’ ব’লে যদি কেউ অহুতাপে কাদে, তাহ’লে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুষক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

“কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ’লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ’লে তাঁর দর্শন হয় না।

“কৃপা কি সহজে হয় ? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ ক’রতে হবে। ‘আমি কর্তা’ এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ীর কর্তাকে যদি কেউ বলে মহাশয়, আপনি এসে জিনিষ বার ক’রে দিন। তখন কর্তাটি বলে ভাঁড়ারে একজন র’য়েছে আমি আর গিয়ে কি ক’র্ব্ব। যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তাঁর হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

“কৃপা হ’লেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে; তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পা’রছি, আর জগতে কত রকম বিজ্ঞা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ’লে দর্শনলাভ হয়।

“সাজ্জর্ন সাহেব রাত্রে আঁধারে লগ্ন হাতে করে বেড়ায়। তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পার; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

“যদি কেউ সাজ্জর্নকে দেখতে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব কৃপা ক’রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি !

“ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি !”

“ঘরে যদি আলো না জলে সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বলতে হয়। ‘জ্ঞান দীপ জ্বলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না’।”

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিলেন। ঔষধ জল দিয়া পাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিক্ত : বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকা ভাড়া, দিয়া আসিতে পারেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়া ছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার, ও বিজয়ের অগ্রাণু সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পৌছিয়া দিবেন। মাষ্টারও ঐ নৌকায় উঠিলেন।

নৌকা বাগবাজারে অন্নপূর্ণার ঘাটে আসিয়া পৌছিল। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ীর কাছে তাঁহারা পৌছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ গুরুপক্ষের চতুর্থী তিথি। শীতকাল, অল্প অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ইত্যাদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

পঞ্চম খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য
প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথোপকথন ।

29th, MARCH, 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে ।’]

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র । ইংরাজী ২৩শে
মার্চ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ।

মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন ।
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘর । সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা ।
চৈত্রমাসের গঙ্গা । বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে ।

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন । তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও
মধুরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলাগুণগান
করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন । রাখালের অস্থখ হইয়াছে ।
এই কথা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই দেখ রাখালের অস্থখ হইয়াছে । সোডা খেলে কি
ভাল হয় গা ? কি হবে বাপু ! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা ।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন ।
বুঝি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে রাখাল রূপে সাক্ষাৎ নারায়ণ, বালকের
দেহ ধারণ করে এসেছেন । এদিকে কামিনীকাকুনতাসী শুদ্ধআত্মা বালকভক্ত
রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের
চক্ষু, সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল । পরমহংসদেব সেই বালক রাখালকে

বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব !

ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির ! গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে ! শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির । ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে ! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির । নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে ! শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে । আত্মাপেক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে । এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্ত ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, তিনি এখন কোথায় ? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সন্মাপ্তি ?

এই সময়ে গেকুয়াকাপড়পরা অপরিচিত একটা বান্ধালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কশ্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আশ্বে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে । গীতা, ৩, ৬ ।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভক্ত হইতে লাগিল । ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন । আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—

[গেকুয়াবসন ও সন্ন্যাসী ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (গেকুয়াদৃষ্টে) আবার গেকুয়া কেন ? একটা কি পরুলেই হ’লো ! (হাস্ত) একজন ব’লেছিল, “চণ্ডী ছেড়ে হনুম ঢাকী !”—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায় । (সকলের হাস্ত) ।

“বৈরাগ্য তিন চার প্রকার আছে । সংসারের জালায় জলে গেকুয়াবসন প’রেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না । হয় ত কশ্ম নাই,—গেকুয়া প’রে কাশী চ’লে গেল । তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, ‘আমার একটি কশ্ম হইয়াছে, কিছু দিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না’ । আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না । ভগবানের জন্ত একলা একলা কাঁদে । সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য ।

“মিথ্যা কিছুই ভাল নয় । মিথ্যা ভেঁক ভাল নয় । ভেকের মত যদি

মন্টা না হয়, তা হ'লে ক্রমে সৰ্বনাশ হয় । মিথ্যা ব'লতে বা ক'বতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায় । তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল । মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে আর বাহিরে গেরুয়া ! বড় ভয়কর !

[মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক ।]

“এমন কি, যারা সং, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয় । কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গি'ছিলাম । কি একটা আন্লে, ক্রস্ (Cross) আবার জল ছড়াতে লাগলো ; বলে শান্তিজল । এক জন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি ক'রছে !”

একজন ব্রাহ্মভক্ত । কু—বাবু ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তের পক্ষে ও রূপ সাজাও ভাল নয় । ও সব বিষয়ে মন অনেক ক্ষণ রাখায় দোষ হয় । মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হ'য়ে যায় । মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে ।

“আর এক দিন নিমাইসন্ন্যাস কেশবের বাড়ীতে দেখতে গি'ছিলাম । যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ ক'রেছিল । একজন কেশবকে ব'লে, ‘কলির চৈতন্য হ'চ্ছেন আপনি’ । কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ব'লে, ‘তা হলে ইনি কি হলেন ?’ আমি ব'লুম, ‘আমি তোমাদের দাসের দাস । রেগুর রেগু’ । কেশবের লোকমান্য হ'বার ইচ্ছা ছিল ।

[নিত্যসিদ্ধ ও রাগভক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি) । নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এই সব ছোকরা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত । অনেকের সাধা সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা । যেন পাতালফোড়া শিব ;—বসান শিব নয় ।

“নিত্যসিদ্ধ একটা থাক আলাদা । সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয় । এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না । যেমন গ্রহলাদ ।

“সাধারণ লোক সাধন করে ; ঈশ্বরে ভক্তিও করে । আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয় । মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে ; আবার বিষ্ঠাতেও বসে । [সকলে হতবুদ্ধ] ।

“নিত্যসিদ্ধ যেমন মোমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে । নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না ।

“সাধাসাধনা ক’রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয় । এত জপ, এত ধ্যান ক’রতে হ’বে, এইরূপ পূজা ক’রতে হবে, এ সব ‘বিধিবাদী’ ভক্তি । যেমন ধান হ’লে মাঠ পার হ’তে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে । আবার যেমন সমুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে ।

“রাগভক্তি, প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না । তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া । আল দিয়ে যেতে হয় না । সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হ’লো ।

“বলে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না । তখন মাঠের উপর এক নাশ জল । সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ’লো ।

“এই রাগভক্তি, অনুরাগ, এই ভালবাসা, না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না ।

[সমাধিতত্ত্ব ; সবিকল্প ও নির্বিকল্প ।]

অমৃত । মহাশয় ! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুনেছো, কুমুরে পোকা চিন্তা ক’রে আরম্ভলা কুমুরে পোকা ভ’য়ে যায় ; কি রকম জানো ? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয় !

অমৃত । একটুও কি অহং থাকে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে । সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায় । আর যেমন বড় আগুন, আর তার একটি ফিন্‌কি । বাহুজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্ত । আমি তুমি থাকলে তবে আশ্বাদন হয় ।

“কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন । এর নাম ‘জড় সমাধি’,—নির্বিকল্প সমাধি । তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না । যেমন ত্বনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গি’ছিল । একটু নেমেই গলে গেল । ‘তদাকারকারিত’ । তখন আর কে উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর !”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

ষষ্ঠ খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মশক্তি
বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ ।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র

সেনের কথা ।

22nd. JULY. 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আষাঢ়ের কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথি । ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ।
আজ রবিবার । ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়া-
ছেন । অল্প অল্প বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না । রবিবারে তাঁহারা
অবসর পান । অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া
বেলা একটা দুইটার সময় কালীবাটীতে পৌঁছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । ঘরে মণিমল্লিকাদি আরও কয়েকজন
ভক্ত বসিয়াছিলেন ।

রাসমণির কালিবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির
ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির । পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির । সারি সারি শিব
মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর । ঘরের পশ্চিমে অর্ধ মণ্ডলাকার
বারাণ্ডা । সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাশ্রু হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন ।
গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোত্তান । এই
পুষ্পোত্তান বহুদূরব্যাপী । দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত । উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত
—যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তপশ্রা করিয়াছিলেন—ও পূর্বে উত্তানের দুই

প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত । পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দু'একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ । নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও পদ্ম করবী । ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, সে ছবিখানিও আছে ।' আর একটি বুদ্ধদেবের প্রস্তুরময়ী মূর্ত্তীও আছে । তন্ত্রপোষের উপর তিনি উত্তরাস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন । ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট । সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন । ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন । বর্ষাকালে খরশ্রোত যেন সাগর সঙ্গমে পঁহুছিবার জন্ত কত ব্যস্ত । পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ।

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক একটি পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত । বয়স ষাট পঁয়ষাট হইবে । তিনি কিছুদিন পূর্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী-পর্য্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছেন ।

[জ্ঞানযোগ ও 'নির্ঝাণ' মত ।]

মণিমল্লিক । আর একটি সাধুকে দেখলাম । তিনি বলেন ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না । শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এদের মত কি জান ? আগে সাধন চাই ; শম দম তিতিক্ষা চাই । এরা নির্ঝাণের চেষ্টা ক'রছে । এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' । বড় কঠিন পথ । জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ । বড় দূরের কথা ।

"কি রকম জান ? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না । কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে ! শেষ বিচারের পর সমাধি হয় । তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না ।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও জ্ঞানযোগ ।]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় যুব মানতো । পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল । কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটি বাগানে ছিল । আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হ'লো । হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে, অভিমান আছে কি না ? শুন্লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই । আমার সঙ্গে দেখা হ'লো । এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদা ! কথা

ক'য়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই । আমার ব'লে 'ভক্তের সঙ্গ করবার কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত করবে ।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল, আমার আবার ব'লে, 'আপনি একটু শুনুন' । একটা সভায় বিচার হ'য়েছিল—শিব বড় না ব্রাহ্ম বড় । শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে । পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'লে 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রাহ্মাও দেখে নাই ।' কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ শুনে আমার এক দিন ব'লে, 'ওসব ত্যাগ করেছ কেন ? এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়' । আমি কি বলবো, বল্লাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না ।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞাসাগর ।]

“একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল । ঈশ্বরের রূপ মানতো না । কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে বুঝবে ? তিনি আত্মশক্তিরূপে দেখা দিলেন । পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁস হয়ে রইল ! একটু হুঁস হবার পর কা ! কা ! কা ! এই শব্দ কেবল ক'রতে লাগলো ।”

একজন ভক্ত । মহাশয়, বিজ্ঞাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো ?

শ্রী রামকৃষ্ণ । বিজ্ঞাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে ; কিন্তু অন্তদৃষ্টি নাই । অন্তরে সোণা চাপা আছে, যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক'চ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো ; শেষে একবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো । অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো । কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন ক'রতে ক'রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায় ; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয় ।

“ঈশ্বর বিজ্ঞাসাগর বেরূপ কাজ ক'রছে সে খুব ভাল । দয়া খুব ভাল । দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ । দয়া ভাল, মায়া ভাল নয় । মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগ্নে, বাপ, মা এদের উপর ভালবাসা । দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

‘গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ।’ মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত ।]

মাষ্টার । দয়াও কি একটা বস্তু ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে অনেক দূরের কথা । দয়া সত্ত্ব গুণ থেকে হয় । সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার । কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার । প্রকৃতির পার ।

“যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পছন্দিত পাবে না । চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে । সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর । একটা গল্প বলি শুন ।

“একটা লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল । এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধরলে । তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে । একজন চোর ব’লে আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে ? এই কথা ব’লে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো । তখন আর একজন চোর ব’লে, না হে ক্রেটে কি হবে ? একে হাতপা বেধে এখানে ফেলে যাও । তখন তাকে হাত পা বেধে এখানে রেখে চোরেরা চলে গেল । কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ব’লে, আহা, তোমার কি লেগেছে ? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই । তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বলে, ‘আমার সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি ।’ অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বলে, ‘এই রাস্তা ধ’রে যাও, এ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে’ । তখন লোকটি চোরকে ব’লে, ‘ম’শাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন ।’ চোর ব’লে ‘না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে’ ।

“সংসারই অরণ্য । এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্ব-জ্ঞান কে’ড়ে লয় । তমোগুণ জীবের বিনাশ ক’রতে যায় । রজোগুণ সংসারে বন্ধ করে । কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায় । সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয় । সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে । কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না । কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয় । দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায় ! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে ।

‘ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না । যার হয় সে খবর দিতে পারে না । একটা কথা আছে, কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফিরে না ।

“চার বন্ধু ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলো । খুব উঁচু পাঁচীল । ভিতরে কি আছে দেখবার জন্ম সকলে বড় উৎসুক হ’ল । পাঁচীল বেয়ে একজন উঠলো । উকি মেরে বা দেখলে তাতে আবাক হ’য়ে “হা

হা হা হা” বলে ভিতরে পড়ে গেল । আর কোন খবর দিল না । যেই উঠে সেই হা হা হা হা ক’রে প’ড়ে যায় । তখন খবর আর কে দিবে ?

“জড়-ভরত, দত্তাজেয় এরা ব্রহ্ম দর্শন ক’রে আর খবর দিতে পারে নাই । ব্রহ্মজ্ঞান হ’য়ে সমাধি হ’লে আর আমি থাকে না । তাই রামপ্রসাদ বলেছে, ‘আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা’ । মনের লয় হওয়া চাই আবার ‘রামপ্রসাদের লয়’ অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয়, হওয়া চাই । তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় ।

একজন ভক্ত । মহাশয় ! শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই । তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছেন । কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্ত । পরীক্ষিতকে ভাগবত বলবেন, আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব ‘আমি’র লয় করেন নাই । বিচার ‘আমি’ এক রেখে দিয়েছিলেন ।

[দল (সাম্প্রদায়িকতা) ও ব্রহ্মজ্ঞান ; কেশবচন্দ্র সেন ।]

একজন ভক্ত । ব্রহ্মজ্ঞান হ’লে কি দলটল থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল । কেশব ব’লে আরও বলুন । আমি বলুম, আর ব’লে দলটল থাকে না । তখন কেশব ব’লে, তবে আর থাক, মশাই । (সকলের হাস্য) । তবু আমি কেশবকে বলুম, ‘আমি’ ‘আমার’ এটা অজ্ঞান । ‘আমি কর্তা’ আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয় মান, সম্বন্ধ, এ ভাব অজ্ঞান না হ’লে হয় না । তখন কেশব ব’লে, মহাশয় ‘আমি’ ত্যাগ ক’রলে যে আর কিছুই থাকে না । আমি বলুম, ‘কেশব, তোমাকে সব ‘আমি’ ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি ‘কাঁচা আমি’ ত্যাগ কর । ‘আমি কর্তা’ আমার স্ত্রী পুত্র ‘আমি গুরু’ এ সব অভিমান, ‘কাঁচা আমি’ এইটি ত্যাগ কর । এইটি ত্যাগ ক’রে ‘পাকা আমি’ হ’য়ে থাকো । ‘আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা ।’

[আদেশ ও ধর্মপ্রচার ।]

একজন ভক্ত । “পাকা আমি” কি দল করতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কেশব সেনকে বলুম, আমি দলপতি, আমি দল ক’রেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি, এ ‘আমি’ ‘কাঁচা আমি’ । মতপ্রচার বড় কঠিন । ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না । তাঁর আদেশ চাই । যেমন

শুকদেব ভাগবত কথা ব'লতে আদেশ পেয়েছিলেন । যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, তা হ'লে দোষ নাই । তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি' ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবকে ব'লেছিলাম 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর । 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই ।

“আর, তুমি দল দল ক'রছ । তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে । কেশব ব'লে, মহাশয় তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল । যাবার সময় আবার আমায় গালাগালি দিয়ে গেল । আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয় !

“আর কেশবকে ব'লেছিলাম, তুমি আত্মাশক্তিকে মানো । ব্রহ্ম আত্মশক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি । যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয় । ব'লতে গেলেই দুটো । কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল ।

“এক দিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল । আমি ব'ললাম, তোমার লেকচার শুন্বো । চাঁদনীতে ব'সে লেকচার দিলে । তার পর ঘাটে এসে ব'সে অনেক কথাবার্তা হ'ল । আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত । তিনিই একরূপে ভাগবত । তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান । কেশব বলে, আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে ব'লে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান । যখন বললাম, 'বলো গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণব', তখন কেশব ব'লে, 'মহাশয়, এখন এত দূর নয় ; তা'হলে লোকে গোঁড়া ব'লবে' ।

“ত্রিশতাব্দীত হওয়া বড় কঠিন । ঈশ্বর লাভ না ক'রলে হয় না । জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে । এই মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না । এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে । হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর পেয়েছিল । এক দিন দেখি, সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্ত । আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন ? হৃদে ব'লে, 'মামা, এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব । বড় হ'লে লাঙ্গল টানবে' ।

“যাই এ কথা বলেছে আমি মূচ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম ! মনে হ'য়েছিল, কি মায়ার খেলা ! কোথায় কামারপুকুর সিঁড়ি, কোথায় কলকাতা ! এই বাছুরটি যাবে, ওই পথ । সেখানে বড় হ'বে ! তার পর কত দিন পরে লাঙ্গল টানবে ! এরই নাম সংসার,—এরই নাম মায়া ! অনেক ক্ষণ পরে মূচ্ছা ভেঙ্গে ছিল ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

['সমাধি-মন্দিরে' ।]

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিস্থ ! দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে ! কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্তন করেন ।

তিনটা চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে বসিয়া আছেন । ভাবাবিষ্ট । কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, 'মা, ওকে এক কল দিলি কেন ?' ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । আবার বলিতেছেন, 'মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে । এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবনিকা হবে' ।

(ঠাকুর কি সান্ন্যাসীদের ভিতর এইরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন ? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীব শিক্ষা দিবেন ? মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন । ঠাকুর এখনও আবিষ্ট । রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ ক'রেছিলি ? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে । ঐষধ ঠিক পড়বে ব'লে ?' পীলে মুখ তুললে পর মন্সার পাতা টাতা দিতে হয়' ।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ ! তবে এখানে থাকে কেন ? তার মানে আছে, জটিলে কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় ।"

(মাষ্টারের প্রতি) । ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয় । জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান ? যিনি জগতকে ধারণ করে আছেন । তিনি না ধর'লে, তিনি না পালন ক'রলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় ? মনকরীকে যে বশ ক'রতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন ।

রাখাল । 'মন-মত্ত-করী' !

শ্রীরামকৃষ্ণ । সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জয় করে রয়েছে ।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতে লাগিল । সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন । ঘরে ধূনা দেওয়া হইল । ঠাকুর বদ্ধাঙ্গলি হইয়া ছোট তক্তাপোষটির উপর বসিয়া আছেন । মার চিন্তা করিতেছেন । বেলঘরের শ্রীমুত গোবিন্দ মুখ্যো ও তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেজ্ঞেতে বসিলেন । মাষ্টারও বসিয়া আছেন । রাখালও আছেন ।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে । জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে । ঘরের ভিতরে সকলে

নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শাস্ত মূর্তি দেখিতেছেন । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট । কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন । এখনও ভাবাবস্থা ।

[শ্রামাক্ষপ—পুরুষ প্রকৃতি—যোগমায়া—শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণ
স্বপ্নের ব্যাখ্যা—‘উত্তম ভক্ত’—বিচার পথ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) । বল তোমাদের যা সংশয় । আমি সব বলছি ।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন ।

গোবিন্দ । আজ্ঞা, শ্রামা এ রূপটি হ’ল কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে দূর বলে । কাছে গেলে কোন রংই নাই ! দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল কোন রং নাই । আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ । কাছের আকাশ দেখ, কোন রং নাই । ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম রূপ নাই, পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার ‘আমার শ্রামা মা’ ! যেন ঘাসফুলের রং !

“শ্রামা পুরুষ না প্রকৃতি ? এক জন ভক্ত পূজা করেছিল । এক জন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে রয়েছে । সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ ! ভক্তটি বললে, “ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ ! আমি এখনও চিনিতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি ! তাই পৈতে পরিয়েছি ।”

“যিনি শ্রামা, তিনিই ব্রহ্ম । যারই রূপ, তিনিই অরূপ । যিনি সত্ত্ব তিনিই নিগুণ । ব্রহ্মশক্তি—শক্তি ব্রহ্ম । অভেদ । সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী ।”

গোবিন্দ । যোগমায়া কেন বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ । যা কিছু দেখছ সবই পুরুষপ্রকৃতির যোগ ! শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন । শিব শব্দ হয়ে পড়ে আছেন । কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন । এই সমস্তই পুরুষপ্রকৃতির যোগ । পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব্দ হয়ে আছেন । পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন ।

“রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিরও মানে ঐ । ঐ যোগের জন্ত বন্ধিম ভাব । সেই যোগ দেখার জন্তই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা ; শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর । শ্রীমতীর গৌর বরণ, মুক্তার গায় উজ্জ্বল । শ্রীকৃষ্ণের শ্রামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর । আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন ।

“উত্তম ভক্ত কে ? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীব জগৎ, চতু-
বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন । প্রথমে ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার ক’রে ছাদে পৌঁছিতে
হয় । তার পর সে দেখে, ছাদও যে জিনিষে তৈয়ারি—ইট, চূণ, শুরুকি—
সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারি । তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হয়েছেন ।

“শুধু বিচার ! থু ! থু !—কাজ নাই ।”

এই বলিয়া ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন ।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন, ‘কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাকব ?
যতক্ষণ ‘আমি তুমি’ আছি ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোবিন্দের প্রতি) । কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই
তুমি । আবার কখনও ‘তুমিই তুমি’ হয়ে যায় ! তখন আমি খুঁজে পাই না ।

“শক্তিরই অবতার । এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটা ঢেউ ।

“অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয় । তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্যরূপে
তিনি আছেন । চৈতন্যলাভের পর আনন্দ । ‘অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ ।’

[ঈশ্বরের রূপ । ভোগবাসনা ও ব্যাকুলতা ।]

(মাষ্টারের প্রতি) । আর তোমায় বলছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস
কোরো না ! রূপ আছে বিশ্বাস কোরো ! তার পর যে রূপটা ভালবাস
সেইরূপ ধ্যান কোরো ।

(গোবিন্দের প্রতি) । কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকে, ততক্ষণ
ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না । ছেলে, খেলা নিয়ে,
ভুলে থাকে ! সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ থাকে । যখন খেলাও ভাল
লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে ‘মা যাব’ । আর সন্দেশ চায়
না । যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে
নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে । যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে ।

“সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় । তখন কি
করে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয় । যে যা বলে তাই শুনে ।”

মাষ্টার (স্বপ্নতঃ) ভোগবাসনা গেলে তবে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

সপ্তম খণ্ড ।

[দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে ।]

19th August, 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে । শ্রাবণ কৃষ্ণ-প্রতিপদ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ।

আজ রবিবার । এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল । ঠাকুর-ঘর বন্ধ হইল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে-ছেন । বিশ্রামের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল—তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তা-পোষের উপর বসিয়া আছেন । এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্তসঙ্ঘক্ষে কথা হইতে লাগিল ।

[বেদান্তবাদীদিগের মত ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে । আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোহম্,' অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা । এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয় । সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপ হ'তে পারে ?

“বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত । সুখ-দুঃখ, পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার ক'রতে পারে না ;—তবে দেহাভিমानी লোকদের কষ্ট দিতে পারে । ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু ক'রতে পারে না ।

“কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত ব'লতো, আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ । তা, সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয় ।

[পাপ ও পুণ্য । মায়া না দয়া ?]

“কিন্তু ‘আমি মুক্ত’ এ অভিমান খুব ভাল । ‘আমি মুক্ত’ এ কথা ব’লতে ব’লতে সে মুক্ত হ’য়ে যায় । আবার ‘আমি বদ্ধ,’ ‘আমি বদ্ধ,’ এ কথা ব’লতে ব’লতে সে ব্যক্তি বদ্ধই হ’য়ে যায় । যে কেবল বলে, ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ সেই শালাই পড়ে যায় । বরং ব’লতে হয়, আমি তাঁর নাম ক’রেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি !

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হ’য়েছে । হৃদে * চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ । একি মায়া না দয়া ?

মাষ্টার কি বলিবেন ? চুপ করিয়া রহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগ্নী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা । আর দয়া মানে—সর্বভূতে ভালবাসা । আমার এটা কি হ’লো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক’রেছিল—অনেক সেবা ক’রেছিল—হাতে করে ও পরিষ্কার ক’রতো । আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল ! এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ ক’রতে গি’ছিলুম । কিন্তু আমার অনেক ক’রেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে আমার মনটা স্থির হয় ! কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব’লতে যাব ? কে ব’লে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[‘মুগ্ধর আধারে চিন্ময়ী দেবী’ ।]

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ?

ঠাকুর বলিলেন, ‘হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ’য়ে আছে ।’ হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না ।

* হৃদয় ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে প্রায় তেইশ বৎসর পরমহংস-দেবের সেবা করিয়াছিলেন । সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয় । তাঁহার জন্মভূমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম । ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ও কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ । ১৩০৬সালের বৈশাখমাসে দ্বিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে ।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনীনাগক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সিংহবাহিনী আমি দেখতে গি'ছিলুম । চাষাধোপাড়া আর এক জন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখলুম । পোড়ো বাড়ী । তারা গরীব হ'য়ে গেছে । এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর ঝুর ক'রে বালি শুরকি পড়ছে, অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই । (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি ?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার ক'রতে হয় । সংস্কার, প্রারব্ধ এ সব মানতে হয় ।

(মাষ্টারের প্রতি) “আর পোড়ো বাড়ীতে দেখলুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জল্ জল্ ক'রছে ! আবির্ভাব মানতে হয় ।

“আমি একবার বিষ্ণুপুরে গি'ছিলুম । রাজার বেশ সব ঠাকুর-বাড়ী আছে সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃগয়ী । ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি । লালবাঁধ । আচ্ছা দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি ? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃগয়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয় ! আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই । আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃগয়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত ।”

[ভক্তের সুখ দুঃখ । ভাগবত ও মহাভারতের কথা ।]

এত ক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন । কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল । একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন । তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয় ! ইয়াকুব গা' কিন্তু একজন বড় ভক্ত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম । কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিল ; তার বুকে পাষণ দিয়ে রেখেছিল । কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র । দেহধারণ ক'রলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে ।

“শ্রীমন্ত বড় ভক্ত । আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ । মশানে কাটতে নিয়ে গি'ছিলো ।

“এক জন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন,—কত কৃপা করলেন । কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর যুচলো না !

সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজশঙ্খচক্রগদাপাদধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

মাটির। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান ক'রুলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচলো না। (সকলের হাস্য।) পূর্বজন্মের কর্ম ছিল, তাই ভোগ।

মণি। যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের স্বখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তেরও জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে; সে ঐশ্বর্য কখনও যা'বার নয়। দেখ না—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তাঁরা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাঁদের মত জ্ঞানী, তাঁদের মত ভক্ত কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাধি-মন্দিরে।

(কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

এমন সময় নরেন্দ্র ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল,—রাজপ্রতিনিধি। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ; বি, এ, পড়ি-
ভেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে, দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহার। প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলান ছিল। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বাঁয়া ও তবলার স্বর বাধা হইতে লাগিল;—কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। দেখ, এ আর তেমন বাজে না!

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য।)
পূর্ণকুণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাণ্ডেনের প্রতি) কিন্তু নারদাদি ?

কাণ্ডেন। তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন ;
—দয়ার জন্ত, পরের হিতের জন্ত তাঁরা কথা ক'য়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,—

গীত।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।

(সে দিন কবে বা হ'বে)

নিরখি নিরখি অতুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।

জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,

অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,

চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,

আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শাস্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,

বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।

এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।

শুদ্ধমপাপবিক্রম রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,

আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।

ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস হে,

জালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ,

আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,

আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।

(সে দিন কবে হ'বে) ॥

আনন্দ অমৃতরূপে, এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব-আশ্র। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহ একেবারে নাই। শ্বাস বহিছে, কি না বহিছে! স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য চিত্তার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সমাধিভঙ্গের পর ।

[সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় । জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ ।]

সমাধি ভঙ্গ হইল । ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন । সেখানে হাজরা মহাশয় কক্ষলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন । তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতে লাগিলেন । এদিকে ঘরে এক ঘর লোক হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন । দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই । শূণ্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে । আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগুণ জ্বলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল !

(কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তদিগের প্রতি) । চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে । চিদানন্দ আছেই ;—কেবল আবরণ ও বিপেক্ষ । বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরে প্রতি মতি তত বাড়বে ।

কাপ্তেন । কলিকাতার বাড়ীর দিকে মস্ত আসবে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে । আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন । ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয় । সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায় ।

“জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে । তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ । সে সর্বদা স্বরূপে থাকে । ভক্তের ভিতর একটানা নয় ; জোয়ার ভাঁটা হয় । হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় । ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক’ত্তে ভালবাসে—কখন সঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ ‘টাপুর টুপুর’—‘টাপুর টুপুর’—করে । (সকলের হাস্য) ।

(সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী । ব্রহ্ম ও আত্মশক্তি অভেদ ।)

“জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায় । ভক্তের ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ । কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী ; যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি ; মণির জ্যোতিঃ ব’লেই মণি

বুঝায়, মণি ব'লেই জ্যোতিঃ বুঝায় । মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না ।

“এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ—‘সে তো তুমিই গো তারা !’ যেখানে কাব্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি ! কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হ'লেও জল । সেই সচ্চিদানন্দই আত্মশক্তি—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন । যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না, তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা ক'রছেন, তখনও তিনি ; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি ;—কেবল উপাধিবিবেশ

কাপ্তেন । আজ্ঞা হাঁ, মহাশয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম

কাপ্তেন । কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, স্ত্রীবিদ্বেষ ;—সাধু নন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । কাপ্তেন সাধুতার কারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে ।

কাপ্তেন । মহাশয়, আপনি যাবেন, তা সাধু ক'রবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) । তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্ত, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না ? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে ! তবে না তুমি বল, ‘ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ’—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হ'য়েছেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্রসঙ্গে ।]

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন । কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ধরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন ।

উত্তর-পূর্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় গুরু জ্ঞানবিচার করে ;—বলে, ‘স্বপ্নবৎ,—পূজা নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা কর । উদ্দেশ্য আর ‘আমিই সেই’ ।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি গো ! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্ছে ?

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । আমাদের কত কি কথা হ'চ্ছে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক । শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেই খানে, নিয়ে যায় । ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ ।

নরেন্দ্র । 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে ।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamiltonএ পড়লুম—লিখছেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । এর মানে কি গা ?

নরেন্দ্র । Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত-মুখ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে । তখন ধর্মের আরম্ভ হয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । Thank you ! Thank you !

(সকলের হাস্য ।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

(সন্ধ্যা-সমাগমে ।)

কিয়ৎকাল পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন । নরেন্দ্রও বিদায় লইলেন ।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল । সন্ধ্যা হয় হয় । ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল । কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ ও অন্তর শুটি করিতেছেন ; শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে । দক্ষিণেশ্বর-গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে । তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমকবাহী নির্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরশ্রোত ঈষৎচিবিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছে । তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিত্তাশীল পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন ।

সন্ধ্যা হইল । ফরাস আলোগুলি জালিয়া দিয়া গেল । পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জালিয়া ধুনা দিল । এদিকে স্বাদশমন্দিরে শিষ্ট

আরতি আরম্ভ হইল, তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল । কঁাসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা, মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—মধুর ও গম্ভীর—কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা !

শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ । কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল । বৃহৎ উঠান ও উঠানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্রাবিত হইল । এদিকে জ্যোৎস্নাম্পর্শে ভাগীরথীমলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।

সন্ধ্যার পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া, হাততালি দিয়া হরিশ্বনি করিতে লাগিলেন । কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি ;—ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি । তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন । আবার বালিতে লাগিলেন, ব্রহ্ম-আত্মা-গণেশ, ভাগবতভক্ত-ভগবান্ ; ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম ; বেদ পুরাণ, তন্ত্র ; গীতা ; গায়ত্রী । শরণাগত শরণাগত ; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু ; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি ।

নামের পর করঘোড়ে জগন্মাতার চিত্তা করিতে লাগিলেন ।

দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাসমাগমে উঠানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন । তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন ।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট । মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন ।

(নরেন্দ্রের কত গুণ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্য-সিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি । এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ । দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ) করে না । আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসিতে ব'লে—তা চেয়েও দেখলে না । আমারই অপেক্ষা রাখে না ! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্ । মায়ামোহ নাই ;—যেন, কোন বন্ধন নাই ! খুব ভাল আধার । একাধারে অনেকগুণ ; গাইতে বাজাতে, লিখিতে পড়িতে । এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে, বিয়ে কোরবো না । নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন দ্বী পুরুষ । নরেন্দ্র বেশী আসে না । সে ভাল । বেশী এলে আমি বিহ্বল হই ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

অষ্টম খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত
কথোপকথন ।

26th NOVEMBER, 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে’ ।]

কান্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি । ইংরাজী ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩
খ্রীষ্টাব্দ । শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের বাটীতে সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন
হইত । বাড়ীটি চিৎপুর রোডের উপর ; পূর্বধারে হারিসন রোডের চৌমাথা
— যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অগ্ন্যাগ্নি মেওয়ার দোকান আছে,
সেখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে । সমাজের অধিবেশন
রাজপথের পার্শ্ববর্তী দুতলার হলঘরে হইত । আজ সমাজের সাপ্তাহিক ;
তাই শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন ।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে,
নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় স্নোভিত । গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া
প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে । গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই,
অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাযানে স্থাপিত স্তম্ভর
বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । মাঝে মাঝে গৃহস্থায়ী ও তাঁহার আত্মীয়-
গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন ।
সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন । তাঁহারা
আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত । আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-

হংসদেবের শুভাগমন হইবে । ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন, তাই তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদের এত প্রিয় । পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতোয়ারা ; তাঁহার প্রেম, তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের গায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জ্ঞান তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয় কথাবর্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথাপ্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্ম-সমন্বয় ও অপর ধর্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জ্ঞান রোদন,—এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে । তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন ।

[শিবনাথ ও সত্যকথা ।]

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত সহাস্র বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন । সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে ।

পরমহংসদেব বলিলেন, “হ্যাঁগা, শিবনাথ আসবে না ?” একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত বলিলেন, “না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না ।” পরমহংসদেব বলিলেন, “শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, বেন ভক্তিরসে ডুবে আছে ; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা’তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে । তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই । আমাকে ব’লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটিতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই ; ওটা ভাল নয় । এই রকম আছে যে, **সত্য কথাই বলিল তপস্যা** । সত্যকে আঁট ক’রে ধ’রে থাকলে ভগবান্ লাভ হয় । সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ’য়ে যায় । আমি এই ভেবে, যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহে যাব, যদি বাহে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক’রে ঝাউতলার দিকে যাই । ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায় ! আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক’রে ব’লেছিলাম, ‘মা ! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও মা ; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও মা ; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমার শুদ্ধাভক্তি

দাও মা ; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ. শুদ্ধভক্তি
দাও ।’ যখন এই সব বলেছিলুম, তখন একথা বলি র নাই, মা !
এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য ।’ স দিতে পারলুম,
‘সত্য’ মাকে দিতে পারলুম না ।”

[‘সমাধি মন্দির’]

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল । বেদীর উপরে
আচার্য্য, সম্মুখে সেজ । উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত
মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্তরে সেই পুরাতন আৰ্য্য
ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত, নাম গান
করিতে লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন—“সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্
যদ্বিতীতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিহ্বম্” । প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি
ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল । অনেকের অন্তরে বাসনা নিক্সাপিত-
প্রায় হইল । চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল । সকলেরই চক্ষু
মুদ্রিত ;—কণকালের জন্ত বেদোক্ত স্বগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন আছেন । স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্ত-
পুতুলির গ্রায় বসিয়া রহিলেন । আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ
করিতেছেন ; আর দেহটী মাত্র শূন্যমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে ।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে
লাগিলেন । দেখিলেন সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র । তখন “ব্রহ্ম”
“ব্রহ্ম” বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন । উপাসনাস্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল
করতাল লইয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম্যানন্দে
মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই নৃত্য দেখিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও
অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ।—অনেকে
এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সন্তোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া
গেলেন । কণকালের জন্ত তাঁহারা হরি-রস পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া
গেলেন । বিষয় স্থখের রস তিষ্ঠবোধ করিতে লাগিলেন । কীর্ত্তনাস্তে সকলে
আসন গ্রহণ করিলেন । ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্ত সকলে তাঁহাকে
ঘেরিয়া বসিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ।]

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—“নির্লিপ্ত হ’য়ে সংসার করা বড় কঠিন । প্রতাপ ব’লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত । জনক নির্লিপ্ত হ’য়ে সংসার ক’রেছিলেন, আমরাও তাই ক’রবো । আমি বল্লম ; মনে করলেই কি জনক রাজা হওয়া যায় ? জনক-রাজা কত তপস্বী ক’রে জ্ঞান লাভ ক’রেছিলেন ! হেটমুণ্ড উদ্ধপদ হ’য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্বী ক’রে, তবে সংসারে ফিরে গিচ্ছিলেন ।”

“তবে সংসারীর কি উপায় নাই ?—হাঁ, অবশ্য আছে । দিনকতক নির্জনে সাধন কর্তে হয় । নির্জনে ক’লে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয় ; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই । যখন নির্জনে সাধন ক’রবে তখন সংসার থেকে একবারে তফাতে যাবে ; তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে । নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই ; ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব । আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্ম প্রার্থনা ক’রবে ।

“যদি বল, কত দিন নির্জনে সংসার ছেড়ে থাকবো ? তা এক দিন যদি এই রকম ক’রে থাক, সেও ভাল ; তিন দিন থাকলে, আরও ভাল ; বা বারোদিন, এক মাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে । জ্ঞান ভক্তি লাভ ক’রে, সংসার ক’রলে, আর বেশী ভয় নাই ।

“হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাজলে হাতে আটা লাগে না । চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেলে আর ভয় নাই । একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোতা থাক, মাটি থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাকবে ।

মনটী দুধের মত । সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ’লে দুধে জলে মিশে যাবে, তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে রাখন তুলতে হয় । মন-দুধ থেকে, যখন নির্জনে সাধন ক’রে, জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হ’লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায় । সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হ’য়ে ভাসবে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[বিজয়ের নির্জনে সাধন ।]

শ্রীমুখ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন । সেখানে অনেক দিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল । এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন । অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তমুখ । পরমহংসদেবের নিকট হেটমুখ হইয়া রহিয়াছেন ; যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন ।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, “বিজয় ! তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ ?”

“দেখ, দু’জন সাধু ভ্রমণ ক’রতে ক’রতে একটি সহরে এসে প’ড়েছিল । একজন হাঁ করে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখছিল ; এমন সময়ে অপরটির সঙ্গে দেখা হ’ল । তখন সে সাধুটী বলে, তুমি হাঁ করে সহর দেখছ, তন্নী তান্না কোথায় ? প্রথম সাধুটী বলে, আমি আগে বাসা পাক্ড়ে, তন্নী তান্না রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ’য়ে বেরিয়েছি । এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি । তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ ?”

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) “দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে ।”

[বিজয় ও শিবনাথ । নিষ্কাম কৰ্ম ও সাকাম কৰ্ম ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট । খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কৰ্ম কর্তে হয় । বিষয়-কৰ্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে ।

“শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্কে একটি গুরু ক’রেছিলেন । এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্তে ছিল, একটি চিল এসে একটা মাছ ছেঁা মেয়ে নিয়ে গেল । কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক’রে গেল ; আর এক সঙ্গে কুঁ কুঁ ক’রে বড় গোলমাল কর্তে লাগলো । মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো । দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল ; কাকগুলোও সেই দিকে গেল ; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল ।

এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুরতে লাগলো । শেষে ব্যতিবাস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল । তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল । চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসলো । ব'সে ভাবতে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল । এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম ।”

“অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'রলেন যে, যতক্ষণ সঙ্কে মাছ থাকে অথাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কৰ্ম্ম থাকে, আর কৰ্ম্মের দাব্বাং ভাবনা, চিন্তা অশান্তি । বাসনাত্যাগ হ'লেই কৰ্ম্ম ক্ষয় হয় আর শান্তি হয় ।”

“তবে নিষ্কাম কৰ্ম্ম ভাল । তাতে অশান্তি হয় না । কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন । মনে ক'রছি, নিষ্কাম কৰ্ম্ম ক'রছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না । আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কৰ্ম্ম ক'র্তে পারে । ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কৰ্ম্ম অনায়াসে করা যায় । ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কৰ্ম্মত্যাগ হয় ; দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্ত কৰ্ম্ম করে ।

[সন্ন্যাসী ও সঙ্কয় ।*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । অবধূতের আর একটা গুরু ছিল—মৌমাছি । মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধুসঙ্কয় করে । কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না । আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায় । মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঙ্কয় ক'র্তে নাই । সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর ক'রবে । তাদের সঙ্কয় ক'র্তে নাই ।

“এটা সংসারীর পক্ষ নয় । সংসারীর সংসার প্রতিপালন ক'রতে হয় । তাই, সঙ্কয়ের দরকার হয় । পন্থী (পাখী) আউর দর্শন (সাধু) সঙ্কয় করে না । কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঙ্কয় করে ;—ছানার জন্ত মুখে ক'রে থাবার আনে ।

“দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্কে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়াল । যদি কাপড় বুচকি থাকে, তা'হলে তাদের বিশ্বাস কোরো না । আমি বটতলায় † ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম । দু'তিন জন বসে আছে ; কেউ ভাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর

* Take no thought for the morrow.”

† রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে ।

ভাণ্ডারার গল্প করছেন। ব'লছেন, “আরে, ও বাবুনে লাখো রুপেয়া খরচ
কিয়া; সাধু লোককে বহুং খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া;
বহুং চিজ তৈয়ার কিয়াথা।” (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি! গয়ার লোটাওয়ানা
সাধু। (সকলের হাস্য)।

[প্রেম, কৰ্মত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কৰ্মত্যাগ
আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কৰ্ম করছেন, তারা করুক। তোমার এখন
সময় হ'য়েছে;—সব ছেড়ে তুমি বোলো, “মন তুই ছাখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে!”

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে
করিতে গান গাইলেন;—

মতনে হৃদয়ে রেখে। আদরিনী স্মৃতি মাঝে।

মন তুই ছাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,

রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।

(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে) ॥

কুরুচি কুমঙ্গী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো,

জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।

(খুব যেন সাবধানে থাকে) ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা,
ভয়, এ সব ত্যাগ কর। ‘আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি
ব'লবে’,—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ।]

“লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।” লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান,
জীবের এ সব পাশ। এ সব গেলে তার সংসার হ'তে মুক্তি হয়।

“পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—ছলভ জিনিস। প্রথমে,
জীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়; তবেই ভক্তি
হয়। শ্রদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

“তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

আপনি কুন্তক হয় । যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায় ।

“প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা । চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল । ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায় । জগৎ ভুল হ'য়ে যায় । আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ,—তাও ভুল হ'য়ে যায় ।”

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন—

সে দিন কবে বা হবে ?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সে দিন কবে বা হবে ?)

সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে)

অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে) ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ভাব ও কুন্তক ।]

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম-ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী । তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাতথ রায় ।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন । আরও বলিতেছেন, “অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোথের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না । এমন কি, চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই । এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুন্তক হয় ।

“ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গরু গরু করে উঠে মাথার দিকে যায় ! তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয় ।”

[শুধু পাণ্ডিত্য ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে) । যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাদের কথা গোলমালে । সামান্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, “ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর !” বেদে যাকে “রসস্বরূপ” ব'লেছে তাঁকে কি না নীরস বলে ! আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই ! তাই এরূপ গোলমালে কথা ।

“একজন ব'লেছিল, ‘আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে’ ! এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না ।” (সকলের হাস্য) ।

[ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ ।]

“কেউ ঐশ্বর্য্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহঙ্কার করে ; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্ম ; কিছুই সঙ্গে যাবে না । একটা গান আছে—

ভেবে দ্যাখ্ অন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভ্রমণে ।

ভুলনা দক্ষিণে কালী বন্ধ হয়ে মায়াজালে ॥

যার জন্ম মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে ।

সেই প্রেমসী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে ॥

দিন দুই তিনের জন্ম ভবে, কর্তা ব'লে সবাই মানে,

সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ॥

[অহঙ্কারের মহোষধ ।]

“আর টাকার অহঙ্কার ক'র্তে নাই । যদি বলো, আমি ধনী, তো ধনীর আবার, তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে । সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি ! কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠলো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল । তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি ! কিছু পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল । চন্দ্র মনে ক'রলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি !—দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হলো ; সূর্য্য উঠছেন । চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল ;—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না ।

“এইগুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না ।”

* * * *

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন । তিনি অনেক যত্ন করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া থাওয়াইয়াছিলেন । যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল ; কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই ।

—:~:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

নবম খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে শুভাগমন ।

28th NOVEMBER, 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটির (Lily Cottage) নামক বাড়ীতে গিয়াছিলেন । কেশব তখন পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন । কেশবকে দেখিয়া, রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আগমন করিলেন ।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন । ঠাকুর দেখিতেছি নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল । বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মপত্নীর সহিত এইরূপ সংসার করেন নাই । ধর্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন । মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই । দেখিতেছি ঠাকুর ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু দেখিতেছেন । টাকা স্পর্শ করিতে পারেন না । ধাতুদ্রব্য ঘটা ও বাটি স্পর্শ করিতে পারেন না । জ্বীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না । এ সব স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটা হত সেই স্থান ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে ! টাকা, সোণা হাতে দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয় ; অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্বের ন্যায়, নিশ্বাস বহিতে থাকে ।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন । সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে ? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি ? যদি বিবাহ না করি, চাকরী তো করিতে হইবে না । বাপ মা কি ত্যাগ করিতে হইবে ? আর আমি বিবাহ

করিয়াছি, সম্ভান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে;—আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, আমি কি করিতেছি! ইনি রাতদিন তৈল-ধারার গায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন; আর আমি? রাতদিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি!! একমাত্র ইহারই দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক স্থানে একটু জ্যোতিঃ। এখন জীবন সমস্তা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে?

“ইনি তো নিজের ক’রে দেখালেন। তবে, এখনও সন্দেহ?”

“ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ!” সত্য কি “বালির বাঁধ”? যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, তাহ’লে আর হিসাব আসবে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, তাহা হ’লে কে রোধ করবে? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাদেব কোপীন ধারণ ক’রেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্তচিন্তা হ’য়ে বনবাসী হ’য়েছিলেন, আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ ক’রেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক’রে বৈরাগী হ’য়েছিলেন, সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি উদয় হয়, তাহা হ’লে এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে!

“আচ্ছা যারা দুর্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসারী জীব যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? দেখি এই প্রেমিক বৈরাগী কি বলেন?”

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ততক্ষণে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ ছিলেন।

[গৃহস্থশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

বৈকুণ্ঠ। আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য কর।

বৈকুণ্ঠ। মহাশয়! সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন

তাঁকে ভুলে, মানুষ ‘আমার’ ‘আমার’ করে। আর মায়ায় বদ্ধ হ’য়ে, কামিনী-

কাঞ্চনে মুগ্ধ হ'য়ে, মাহুৰ আরও ভোবে । মায়াতে এমনই মাহুৰ অজ্ঞান
হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না । একটা গান আছে—

“এমনি মহা মায়ায় মায়া রেখেছে কি কুহক করে ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে ॥

বিল ক'রে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে ।

গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে পারে ॥

গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে ।

মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে ॥

“তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য । এই বাড়ীই দেখো
না কেন ? কত লোক এলো গেলো ! কত জন্মালো, কত দেহত্যাগ
ক'রুলে ! সংসার এই আছে, এই নাই । অনিত্য ! যাদের এতো ‘আমার’
‘আমার’ ক'রুছো, চোখ বুঝলেই নাই । কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাঁদে
যাওয়া হয় না ! ‘আমার হারুর কি হবে ?’ ‘গতায়াতের পথ আছে, তবু
মীন পালাতে পারে’ । গুটীপোকা আপন নালে আপনি মরে ! একপ
সংসার মিথ্যা ; অনিত্য ।

প্রতিবেশী ! মহাশয় ! এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখবো
কেন ? যদি সংসার অনিত্য এক হাতই বা সংসারে দিব কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে জেনে সংসার করুলে, অনিত্য নয় । গান শোন ।

মনুরে কৃষ্ণি কাম্য জ্ঞান না ।

এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ ক'লে ফলতো সোণা ॥

কালী নামে দাওরে বেড়া কসলে তছরূপ হবে না ।

সে যে মুকুটেশ্বরী শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেসে না ॥

অন্ত কিম্বা শতাব্দান্তে, রাজাপ্ত হবে জ্ঞান না ।

এখন আপন একতারে (মনুরে), চুটিয়ে কসল কেটে নেনা ॥

গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি-বারি সেঁচে দেনা ।

একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

(গৃহস্থাশ্রম ও ঈশ্বর ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । গান শুনলে ? ‘কালী নামে দাওরে বেড়া কসলে তছরূপ হবে না ।’ ঈশ্বরের শরণাগত হও, তা’হলে সব পাঁবে । ‘সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ।’ শক্ত বেড়া ! তাঁকে যদি লাভ ক’রতে পার, সংসার অসার ব’লে বোধ হবে না । যে তাঁকে জেনেছে, সে যেথো যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন ! ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছে । পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা ক’রবে : তাঁকে জেনে সংসার ক’রলে লোকের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না । দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে । ভক্তের সেবা করে । সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁহার সেবা দুজনে করে ।

প্রতিবেশী । মহাশয়, একরূপ স্ত্রীপুরুষ তো দেখা যায় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আছে ;—অতি বিরল ;—বিষয়ী লোকেরা তাদের চিন্তে পারে না । তবে একরূপটি হ’তে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই । দুই জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা’হলেই এটা সম্ভব হয় । ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই । না হ’লে সর্বদা অমিল হয় । এক জনকে তৃপ্তিতে যেতে হয় । যদি না মিল হয়, তা হ’লে বড় যন্ত্রণা । স্ত্রী হয়তো রাত দিন বলে, “বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে ! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম, না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না ! তুমি আমায় কি স্থখে রেখেছ । চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর ক’রছেন । ও সব পাগলামী ছাড়ে !”

একজন ভক্ত । এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য । তার পর কত আপদ আছে । তবে মহাশয় উপায় কি ?

[উপায় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন । অনেক ব্যাঘাত—তা আর তোমাদের বলতে হবে না—রোগ, শোক, দারিদ্র্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্থ, গোয়ার । তবে উপায় আছে । মাঝে মাঝে

নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা ক'রতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্ত চেষ্টা করতে হয় ।

প্রতিবেশী । বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । একবারে নয় । যখন অবসর পাবে, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একদিন দুদিন থাকবে—যেন কোন সংসারের সঙ্গে সংস্পর্শ না থাকে, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ না ক'রতে হয় । হয় নির্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ ।

প্রতিবেশী । সাধু চিন্তা কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর মন প্রাণ অন্তরাহ্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু । যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু । যিনি সাধু তিনি জীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না—সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন ;—যদি জীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন । সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন । ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না । আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন । মোটামুটি এই গুলি সাধুর লক্ষণ ।

প্রতিবেশী । নির্জনে বরাবর থাকতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ফুটপাথের গাছ দেখছ ? যত দিন চারা, চারিদিকে বেড়া দিতে হয় । না হ'লে ছাগল গরু খেয়ে ফেলবে । গাছের গুঁড়ী মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই । তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না । গুঁড়ি যদি ক'রে নিতে পারো, আর ভাবনা কি, ভয় কি ? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর । তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না ।

প্রতিবেশী । বিবেক কাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর সং আর সব অসং, এই বিচার । সং মানে নিত্য । অসং—অনিত্য । যার বিবেক হ'য়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু । বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয় ; অসংকে ভালবাসলে—যেমন দেহস্থ, লোক মাগ, টাকা, এই সব ভালবাসলে—ঈশ্বর, যিনি সংস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না । সদসং বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে । শোনো, আর একটা গান শোন ।

আম্ন মন বেড়াতে মাঝি ।

কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।

ওরে বিবেক নামে তার বেটা রে, তব্ব কথা তায় শুধাবি ॥

শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ।

তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে জামা মাকে পাবি ॥

অহঙ্কার অবিন্যাস তোর, পিতা মাতায় ভাড়িয়ে দিবি ।

যদি মোহ গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি ॥

ধন্যধন্য দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি ।

যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি ॥

প্রথম ভাষার সন্তানেব, দূর হতে বুঝাইবি ।

যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি ।

তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয় ; বিবেক হ'লে তবে তব্ব-
কথা মনে উঠে । তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ করে । কালীকল্পতরুমূলে,—
সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনা-
য়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধন্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ । তাঁকে পেলে ধন্য, অর্থ
কাম যা সংসারীর দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায় ।

প্রতিবেশী । তবে সংসার মায়া বলে কেন ?

[বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' ক'রে
ত্যাগ ক'রতে হয় । তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়ে-
ছেন । ঈশ্বরময়াজীবজগৎ । তখন বোধ হয় জীবজগত শুদ্ধ তিনি । যদি একটা
বেলের খোলা শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর এক জন যদি বলে
বেলটা কত ওজনে ছিল একবার দেখত । তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে
দিয়ে শাঁসটা কেবল ওজন ক'রবে ? না ওজন ক'রতে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত
ধ'রতে হ'বে । তবে ব'লতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল । খোলটা যেন
জগৎ ; জীবগুলি যেন বীচি । বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলে-
ছিলে, অবস্তা ব'লেছিলে । বিচার করবার সময় বেলের শাঁসকেই সার খোলা
আর বীচিকে অসার, ব'লে বোধ হয় । বিচার হ'লে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক

ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্তাতে শাস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হ'য়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

“অলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখমও হ'য়েছে। যদি মাখম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ঘোলও হ'য়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

“যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা (phenomenal world) যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute); যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।

“তাকে যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হ'য়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সমস্ত।”

[পাপবোধ। Sense of sin and responsibility.]

প্রতিবেশী। তবে পাপ পুণ্য নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব (Ego) রেখে দেন তাহলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তার। পাপপুণ্য ভালমন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভালমন্দ জ্ঞান, থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো ‘আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি।’ কিন্তু অন্তরে জ্ঞান যে ও সব কথামাত্র, মন্দ কাজটা করলেই মন ধুগ্ধুগ্ধ ক'রবে।

“ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি ‘দাস আমি’ রেখে দেন। সে অবস্থায় তত্ত্ব বলে, আমি দাস তুমি প্রভু! সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা ঈশ্বরীয় কাজ, ভাল লাগে; ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না; ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হলো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী। মহাশয় বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

[‘The Unknown and Unknowable.’]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয়বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী। ঈশ্বরকে কে জানতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হলো। আমাদের এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটা হলেই

খুব হ'লো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিপড়ে গিছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? ১টা ২টা দানা হলেই হেউ চেউ হয়।”

প্রতিবেশী। আমাদের যে বিকার, এক ঘটা জলে হয় কৈ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[রোগ ও ঔষধ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি ঔষধ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই নাই।

[ঔষধ — ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ ।]

“যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব বৃকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'রবো।” তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্ধৃদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন; তখন সব বৃকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটাতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

দশম খণ্ড ।

15th JUNE, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব ।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন । রবিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্ত-সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন ।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত । নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন । আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে ।

সকাল হইতেই সঙ্গীর্জন আরম্ভ হইয়াছে । কীর্তনীয়গণ মাথুর গাহিতেছিল । গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা,—সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল । ঠাকুর মুহূর্মুহঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ।

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্গীর্জন হইতেছে । ঘরের মেঝেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে । এই প্রকোষ্ঠের পূর্বে ও পশ্চিমে একটি করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে । উদ্যান-গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুকুরিণী । গৃহ ও পুকুরিণী ঘাটের মধ্যবর্তী পূর্বপশ্চিমে উদ্যানপথ । পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ । উদ্যান-গৃহের পূর্বধারে পূর্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্যন্ত আর একটি রাস্তা গিয়াছে । লাল সুরকির রাস্তা । তাহারও দুই পাশে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ । ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব ধারে

আর একটা বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উত্তানগৃহের পশ্চিম ধারেও উত্তানগৃহ সেই পথের দক্ষিণ পশ্চিমে রত্নশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উত্তানগৃহের বারাণ্ডাতেও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ একাকী বা বহুদলে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীৰ্ত্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীৰ্ত্তনগৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

মাথুর গান হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাহিতেছেন। গৌরান সন্ধ্যাস করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছেন। আবার তাঁর আদর্শনে নবদ্বীপের ভক্তেরা কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাই কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছেন।—

গান। গৌর একবার চল নদীয়ার।

তৎপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা করিয়া আবার গাহিতেছেন।

* * * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আঁখর দিতেছেন—“সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।” ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নিকট হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিম্নলিতনেত্র! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, “সখি! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে, আমি তোদের দাসী হ’ব; তুই তো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখায়েছিলি! প্রাণবল্লভ!”

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি! যমুনার জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয়সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।”

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, ‘আহা’ ‘আহা’।

কীর্তন চলিতেছে—শ্রীমতীর উক্তি—

গান।

শীতল তছু অঙ্গ (হেরি) সঙ্গস্থ লালসে (হে)

মাঝে মাঝে আঁখর দিতেছেন—

(না হয় তোদের হ'বে, আমায় একবার দেখাগো)।

(ভূষণের ভূষণ গেছে, আর ভূষণে কাজ নাই)

(আমার স্মৃতি গিয়ে দুর্দিন হ'য়েছে)

(দুর্দশার দিন কি দেবী হয় না)

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন —

(সে কাল কি আজও হয় নাই)

কীর্তনীয়া আঁখর দিতেছেন—

(এত কাল গেল, সে কাল কি আজও হয় নাই)

গান।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,

(আমার) কান্না হেন গুণনিধি করে দিয়ে যাব।

না পোড়াও রাখা অঙ্গ, না ভাসাও জলে,

(দেখো যেন অঙ্গ পোড়াও না গো)

(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ভাসাও না গো)

(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ জলে না ডারবি, অনলে না দিবি)

মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে।

(বেঁধে তমালে রাখবি) (তাতে পরশ হবে)

(কালোতো পরশ হবে) (কৃষ্ণ কালো তমাল কালো)

(কালো বড় ভালবাসি) (শিশুকাল হ'তে)

(আমার কান্না অক্লান্ত তনু) (দেখো যেন কান্না ছাড়া

ক'রো না গো)

শ্রীমতীর দশম দশা—মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

গান।

ধনি ভেল মূর্ছিত, হরল পেরান,

(নাম করিতে করিতে) (হাট কি ভাবলি রাই)

তগনিত প্রাণ সখি মুদিল নয়ান।

(ধনি কেন এমন হলো) (এই যে কথা কহিতেছিল) ।

কেহ কেহ চন্দন দেয় ধনীর অঙ্গে

কেহ কেহ রোউত বিষাদতরঙ্গে ।

(সাধের প্রাণ যাবে ব'লে)

কেহ কেহ জল ঢালি দেয় রাইএর বদনে

(যদি বাঁচে) (যে কৃষ্ণ অনুরাগে মরে, সে কি জলে
বাঁচে)

মুচ্ছিতা দেখিয়া সখিরা কৃষ্ণনাম করিতেছেন । শ্রামনামে তাঁহার সংজ্ঞা
হইল । তমাল দেখে ভাবছেন বুঝি সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন ।

গান ।

শ্রাম নামে প্রাণ পেয়ে, ধনি ইতি উতি চায়,

না দেখি সে চাঁদমুখ কঁাদে উভরায় ।

(বলে কই রে শ্রীদাম) (তোরা যার নাম শুনাইলি কই)

(একবার এনে দেখাগো)

সম্মুখে তমাল তরু দেখিবারে পায় ।

(তখন) সেই তমাল তরু করি নিরীক্ষণ

(বলে ঐ যে চূড়া) (আমার কৃষ্ণের ঐ যে চূড়া)

(চূড়া দেখা যায়)

(তমাল গাছে ময়ূর হেরে বলে, ঐ যে চূড়া দেখা
যায়)

সখিরা যুক্তি করিয়া মথুরায় দূতী পাঠাইয়াছেন । তিনি একজন মথুরা-
বাসিনীর সহিত পরিচয় করিলেন—

গান ।

এক রমণী, সমবয়সিনী, নিজ পরিচয় পুছে ।

দূতী ব'লছেন—আমায় ডাক্তে হবে না, সে আপনি আসবে ।

শ্রীমতীর সখি (দূতী) মথুরাবাসিনীর সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেইখানে
ঘাইতেছেন । তৎপরে ব্যাকুল হ'য়ে কঁদে কঁদে ডাকছেন—

“কোথায় হরিহে, গোপীজনজীবন ! প্রাণবল্লভ ! রাধাবল্লভ ! লজ্জা-
নিবারণ হরি ! একবার দেখা দেও । আমি অনেক গরব করে এদের বলেছি,
তুমি আপনি দেখা দিবে ।”

গান ।

মধুপুর নাগরী, হাঁসি কহত ফিরি,

গোকুলে গোপ কৌয়ারী । (হায় গো)

(কেমন করে বা যাবিগো) (এমন কাঙালিনী বেশে) ।

সপ্তম দ্বার, পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা তাঁহা যাওবি নারি ।

(কেমন ক'রে বা যাবি) (তোর সাহস দেখি লাজে মরি

বল কেমন করে যাবি)

হা হা নাগর, গোপীজনজীবন (কাঁহা নাগর,

দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখ ।)

(কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ) (হে মধুরানাথ একবার

দেখা দিয়ে দাসীর মান (প্রাণ) রাখ হরি) (কোথা নাথানন্দ)

(কোথায় আছহে, হৃদয়নাথ হৃদয়বল্লভ ' লজ্জা নিব ।

দাসীর মান রাখ হরি) ।

কি অতুরাগ ! তমাল

হা হা নাগর, গোপীজনজীবন, দূতী ডাকত উভয়নল যে চক্ষের জল

'কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ !' এই কথা শুনিয়'য়ে উড়ে যেতো

হইলেন ।

সায়ের দিগন্তে

কীর্তনান্তে কীর্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীৰ্তন করিতেছেন ।

মান । সমাধিস্থ । কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অক্ষুটস্বরে বলি

কিটু" (কৃষ্ণ, কৃষ্ণ) । ভাবে নিমগ্ন । নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতে

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল । কীর্তনীয়ারা ঐ ভাবের গান গাহি

কি অত

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—

খট মায়া !

"ধনি দাঁড়ালো রে !

ধনি জয়

অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে !

শ্রামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে !

তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে !"

এইবারে নাম সঙ্কীৰ্তন । তাহারা খোল করতাল সঙ্গে গাইতে লাগিল,

"রাধে গোবিন্দ জয় ।"

ভক্তরা সকলেই উন্নত ! ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন । ভক্তরাও তাঁহাকে

বেড়িয়া আনন্দে নাচিতেছেন । মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[সরলতা ও ঈশ্বরলাভ ।]

কীৰ্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময়ে নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই লাড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সন্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, “তুই এসেছিস্ !”

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটা বড় সরল। সরলতা পূৰ্ব্বে জন্মে, অনেক উপস্তা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

না দেখি যেখানে অবতার হ’য়েছেন, সেই খানেই সরলতা।

(বলে—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোকে বলে, “আহা

(নন্দঘোষ !”

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অব-

((ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা))।

(নিরঞ্জনের প্রতি)। “দেখ, তোর মুখে যেন একটা কালো

ছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কি না, তাই প’ড়েছে।

সব পত্র করতে হয়,—আরও নানা রকম কাজ আছে ; সৰ্বদা

সখিল্য।”

বাসিনীগারী লোকেরা যেমন চাকরী করে, তুইও চাকরি করছিস্ ; তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্ত চাকরি স্বীকার ক’রেছিস্। মা গুরুজন—
ব্রহ্মা-মহী-স্বরূপ।। যদি মাগ্ ছেলের জন্ত চাকরি ক’রিস্, তা’হলে আমি বলতুম, ‘ধিক্ ধিক্ ! শত ধিক্ ! একশ’ ছি !’

(মণিষাল্লিকের প্রতি)। দেখ, ছোকরাটা ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই বা দোষ। সে দিন ব’লে গেল যে আসবে, আর এলো না।

(নিরঞ্জনের প্রতি)। তাই রাখাল ব’লছিল,—তুই এ’ড়েকে এসেও দেখা করিস্ নাই কেন ?

নিরঞ্জন । আমি এঁড়েদয়ে সবে দুদিন এসেছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি) । ইনি হেডমাষ্টার । তোর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিচ্ছিলেন । আমি পাঠিয়েছিলাম ।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি সেদিন বাবুরামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম ।]

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্তা কহিতেছেন । সেই ঘরে টেবিল চেয়ার কয়েক থানা জড় করা ছিল । ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অন্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অন্ধেক ব'সেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আহা গোপীদের কি অনুরাগ ! তমাকু দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো— জল হ'তে হ'তে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেতো । কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেতো না । সায়ের দিখিতে হাতি নামলে কেউ টের পায় না ।

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ ! গৌরাক্ষের ঐ রকম হ'য়েছিল । বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারু হয় ! কি অনুরাগ ! কি ভালবাসা ! শুধু বোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা ! এরই নাম প্রেমোন্মাদ । কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে । তাঁর জন্ত ব্যাকুল হ'তে হবে । তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর ;—ভগবান্ মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর ;—তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হোল । তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দিবেন ।

“যদি পাগল হ'তে হয়, নংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে ? যদি পাগল হ'তে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্ত পাগল হও !”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গ ।]

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন । তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটি তাকিয়া দেওয়া হইল । ঠাকুর বসিবার সময় “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন । বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে ; এই জন্ত বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন ! ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিলেন ।

বেলা অনেক হইয়াছে ; এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই । ঠাকুর বালকস্বভাব । বলিলেন, “কৈগো, এখনও যে দেয় না ! নরেন্দ্র কোথায় ?”

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি সহাস্তে) । মহাশয় ! রামবাবু অধ্যক্ষ । তিনি সব দেখছেন । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । রাম অধ্যক্ষ ! তবেই হ'য়েছে !

এক জন ভক্ত । আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । স্বরেন্দ্র কোথায় ? আহা স্বরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে । বড় স্পষ্ট বক্তা,—কারুকে ভয় ক'রে কথা কয় না । আর দেখ খুব মুক্তহস্ত । কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না ।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, কালনায় গিছিলাম । ভগবান দাস খুব বুড়ো হ'য়েছেন । রাতে দেখা হ'য়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন । প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল । চৈচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান । আপনার নাম শুনে ব'লতে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি ? সেই বাড়ীতে নামব্রহ্মের পূজা হয় ।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি) । আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে-যান নাই । ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রুছিলেন ; আর ব'লছিলেন, যে মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল ।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন । ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনতেছিলেন । তিনি মাষ্টারের প্রতি সন্মুখে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ গো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি ?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন ।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে, মহিমার প্রতি)। এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস! (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক বরকম তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে র'য়েছেন। খাওয়ান কি না, তাঁকে আহুতি দেওয়া।

“কিন্তু তা বলে অসং লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে,—ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

“হুদে সিঙড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি ব'ল্লুম ‘দেখ, হুদে, ওদের যদি তুই খাওয়ান, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চ'ল্লুম।’ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে।)

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ, ওরা সব কি ক'রছে; আর, আপনাকে আমি বলতে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন ক'রলে। মহিমাচরণ বলিলেন, “নিয়ে আসুক না, তারপর দেখা যাবে” এই বলিয়া ‘হুঁ হুঁ’ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে

আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্পীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন; ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম (অর্থাৎ দারজিলিং) :

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নাই। তোমার কি অসুখ হ'য়েছে ?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হ'য়েছে।

কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল। কেশবের অগ্ৰাণ্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছিল। তাঁকে আফ্লাদ আমোদ ক'র্ত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে প'ড়তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ মূর্ত্তে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল।

“সময়ে সময়ে তাঁর ভক্তির এত উচ্ছ্বাস হ'তো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'তো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।”

[লোকমাগ্ন ও অহঙ্কার। ‘আমি কর্ত্তা’, ‘আমি গুরু’ ।]

একটি মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্রদেশের মেয়ে, খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। মহাশয়, কি তাঁর নাম শুনেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুনলাম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তার লোকমাগ্ন হবার ইচ্ছা।

“এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। ‘আমি করছি,’ এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর তুমি করছ—এইটো জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।”

“‘আমি’ ‘আমি’ ক'রলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর ‘হাম্ মা, হাম্ মা,’ (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয় ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই; বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেলে। মাংসগুলো লোক খাবে। ছালটা

চামড়া হবে ; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় নাই। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে! যখন ধনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোন্বার সময় ‘তুঁছ তুঁছ’ বলে। আর ‘হাম্ মা, হাম্ মা’ বলে না। তুঁছ তুঁছ বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

“জীবও যখন বলে, ‘হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী’, তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন ক’রে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না ক’রলে অহঙ্কার যায় না। যদি কার অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হ’য়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়! কেমন ক’রে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হ’য়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক’রেছে, তার চারটি লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

“যার ঈশ্বর দর্শন হ’য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত ‘কতু হাসে কতু কাদে’; এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে গাংটা;—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে! তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চূপ ক’রে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক ‘আমি’ ‘আমি’ করে, কিন্তু কার অনিষ্ট ক’রতে জানে না।

“পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোণার তরোয়াল হ’য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কার অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

[বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখলে, সব বল ।

প্রতাপ । বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে । তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে । কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড ! আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম ।

[বিলাত ও কৰ্মযোগ । কলিযুগে কৰ্মযোগ না ভক্তিযোগ ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । বিষয় কৰ্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয় । সব জায়গায় আছে । তবে কি জান ? কৰ্মকাণ্ড হ'চ্ছে আদি কাণ্ড । সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয় । তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে । বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় । আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে ।

“তবে কৰ্ম একবারে ত্যাগ করবার যো নাই । তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কৰ্ম করাবে । তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর । তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম কর । অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম করা ;—কি না কৰ্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না । যেমন পূজা জপ তপ ক'রুছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্ত নয়, কিম্বা পুণ্য করবার জন্ত নয় ।

“একপ অনাসক্ত হ'য়ে কৰ্ম করার নাম কৰ্মযোগ । ভারি কঠিন । একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায় । মনে ক'রুছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করুছি ; কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না । হয়তো পূজা মহোৎসব ক'রলুম, কি অনেক গরিব কাণ্ডালদের সেবা ক'রলুম,—মনে ক'রলুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে ক'রেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হ'য়েছে, জানতে দেয় না ।

“তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যার ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে ।”

একজন ভক্ত । যারা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁহাদের উপায় কি ?

তাঁরা কি বিষয় কৰ্ম সব ছেড়ে দেবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কলিতে ভক্তিযোগ । নারদীয় ভক্তি । ঈশ্বরের নাম গুণ

গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা : 'হে ঈশ্বর আমার জ্ঞান দাও, ~~ভক্তি~~ দেও, আমার দেখা দাও।'

“কর্মযোগ বড় কঠিন । তাই প্রার্থনা ক'রতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও । আর যে টুকু কর্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে ক'রতে পারি । আর যেন বেশী কর্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয় ।'

“কর্ম ছাড়বার যো নাই । আমি চিন্তা ক'রছি, আমি ধ্যান ক'রছি এও কর্ম ।

“ভক্তিলাভ ক'রলে বিষয়কর্ম আপনা আপনি কমে যায় । আর ভাল লাগে না । ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায় ?

একজন ভক্ত । বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম কর' 'কর্ম কর' করে । কর্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয় ?

[জীবনের উদ্দেশ্য কি ? কর্ম না ঈশ্বর লাভ ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ । কর্মতো আদি কাণ্ড ; জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না । তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়,—উদ্দেশ্য নয় ।

“শস্ত্র ব'লে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সব । আমি ব'লুম, এ সব কর্ম অনাসক্ত হ'য়ে ক'রতে পারলে ভাল ; কিন্তু তা বড় কঠিন । আর যাই হোক এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ ; হাসপাতাল, ডিম্পেন্সারী করা নয় ! মনে কর, ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন । এসে ব'ল্লেন, তুমি বর লও ; তা হ'লে তুমি কি ব'লবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী ক'রে দাও ; না ব'লবে 'হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই ।'

“হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী এ সব অনিত্য বস্তু । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু । তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা আমরা অকর্তা । তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি ? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিম্পেন্সারী হ'তে পারে !

['এগিয়ে পড়' ।]

“তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড । কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয় । সাধন করে আরও এগিয়ে পড় । সাধন ক'রতে ক'রতে আরও এগিয়ে পড়লে, শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ।

“একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছিলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ’লো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ‘ওহে, এগিয়ে পড়ো!’ কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে ব’ল্লেন কেন ?

“এই রকমে কিছু দিন যায়। এক দিন সে ব’সে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে ব’ল্লে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাষ্ঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকমে কিছু দিন যায়! আর এক দিন মনে প’ড়লো, ব্রহ্মচারী ব’লেছেন, ‘এগিয়ে পড়’। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপা নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক’রতে লাগলো। এত টাকা হ’লো যে, আঙুল হ’য়ে গেল।

“আবার কিছু দিন যায়। এক দিন ব’সে ভাবছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে ব’লেছেন! এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোণার খনি! তখন সে ভাবলে ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব’লেছিলেন, এগিয়ে পড়!

“আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত প’ড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হ’লো।

“তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ ক’রে উদ্দীপন হ’য়েছে ব’লে মনে করো না, যা হবার তা হ’য়ে গেছে। কৰ্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তা’হলে কৰ্ম্ম নিকাম ক’রতে পারবে। তবে নিকাম কৰ্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি ক’রে ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, ‘হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কৰ্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কৰ্ম্ম যেন নিকাম হ’য়ে ক’রতে পারি।’

“আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।”

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবার তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। শুন্ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি

ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রেছে, তারা তো সব হ'রে প্যালা পকা !
(সকলের হাস্য) ।

(ভক্তদের প্রতি) । দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে । আর
সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই । (সকলের হাস্য) ।

প্রতাপ । মহাশয়, বাজে যদি ব'ল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । দেখো, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেকচার
শুনলে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায় । এক হরিসভায় আমায় নিয়ে
গিছলো । আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী । বলে
কি, 'ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে
নিতে হবে' । এই কথা শুনে আমি অবাক ! তখন একটা গল্প মনে প'ড়লো ।
একটা ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে ;—এক
গোয়াল ঘোঁড়া ! এখন গোয়াল যদি হয়, তা হ'লে কখন ঘোঁড়া থাকতে পারে
না, গরু থাকাই সম্ভব । এরূপ অসম্ভব কথা শুনে লোকে কি ভাবে ? এই
ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নাই । (সকলের হাস্য) ।

একজন ভক্ত । ঘোঁড়া তো নাইই ! গরুও নাই (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ দেখি, যিনি রস সন্ন্যাস তাঁকে কিনা ব'ল্ছে 'নীরস' ।
এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস, কখনও অনুভব করে নাই ।

[প্রতাপের প্রতি উপদেশ । 'আমি' ও 'আমার' ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । দেখ তোমায় বলি । তুমি লেখা পড়া
জান, বুদ্ধিমান, গভীরাত্মা । কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই ।
এসব তো অনেক হ'লো, লেকচার দেওয়া, তর্ক ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ অনেক
তো হ'লো । আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে ? এখন সব মনটা কুড়িয়ে
ঈশ্বরের দিকে দাও । ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও ।

প্রতাপ । আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য । তবে এ সব
করা তাঁর নামটা যাতে থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । তুমি বল্ছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্ত সব ক'ছো ; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাকবে না । একটা গল্প শুন ।

“একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল । কুঁড়ে ঘর । অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রেছিল । কিছুদিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো । কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ ক'র্ত্তে লাগলো । তখন সে ঘররক্ষার জন্ত ভারি চিন্তিত হ'লো ! বল্লে, হে পবনদেব, দেখো যেন ঘরটা ভেঙ্গে না বাবা ! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না । ঘর মড় মড় ক'র্ত্তে লাগলো । তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে ;—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে । যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো—বাবা ! ঘর ভেঙ্গে না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার ! কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে । কেবা তার কথা শুনে ! অনেকবার ‘হনুমানের ঘর’ ‘হনুমানের ঘর’ করার পর দেখলে যে কিছু হ'লো না ! তখন বল্তে লাগলো, বাবা ‘লক্ষ্মণের ঘর’ ‘লক্ষ্মণের ঘর’ । তাতেও হ'লো না । তখন বলে, বাবা, ‘রামের ঘর’ ‘রামের ঘর’ ! দেখো বাবা ভেঙ্গে না, দোহাই তোমার ! তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙতে আরম্ভ হ'লো । তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আশ্বার সময় বল্তে লাগলো,—যা শালার ঘর !

[জীবনের উদ্দেশ্য ; ডুব দাও ।]

(প্রতাপের প্রতি) । কেশবের নাম তোমায় রক্ষা ক'র্ত্তে হবে না । যা কিছু হয়েছে, জান্বে ঈশ্বরের ইচ্ছায় । তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে ; তুমি কি ক'রবে ? তোমার এখন কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও ।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন ।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন ।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ॥ (৬৩ পৃষ্ঠা ।)

(প্রতাপের প্রতি) । গান শুনলে ? লেক্চার, ঝগড়া, ও সব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও । আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই । এ যে অমৃতের সাগর ! মনে কোরো না যে, এতে মানুষ বেহেড়্ হয় ; মনে কোরো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'লে মানুষ পাগল হ'য়ে যায় । আমি নরেন্দ্রকে বল্লেছিলাম—

প্রতাপ । মহাশয়, নরেন্দ্র কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও আছে একটি ছোকরা । আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর । তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই ? আচ্ছা, মনে কর, এক খুলি রস আছে ; তুই মাছি হয়েছিস্ । তা কোন্ খানে ব'সে রস খাবি ? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব । আমি জিজ্ঞাসা ক'লুম, কেন ? কিনারায় ব'স'বি কেন ? সে বললে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব । তখন আমি বল্লুম, বাবা সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই ! এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয় । ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড্ হয় না ।

(ভক্তদের প্রতি) । 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান । রাসমণি কালী বাড়ী ক'রেছেন, এই কথাই লোক বলে । কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন ! 'ব্রহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন' ; একথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটা হ'য়েছে । আমি ক'রছি, এইটীর নাম অজ্ঞান । হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা ; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত ; এইটীর নাম জ্ঞান । হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিষ ; এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিষ ; এর নাম জ্ঞান ।

“আমার জিনিষ, আমার জিনিষ, বলে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া । সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া । শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া ; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নাম মায়া ; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটা দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয় ।

“মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয় । দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয় । শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন ।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী কাকন ।]

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । মহাশয় ! যারা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হ'চ্ছে তো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি বলি যে, সংসার ক'র্ত্তে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাক ।

[গৃহস্থের সাধন ।]

“দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, ‘আমাদের বাড়ী ।’ কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে । মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, ‘আমাদের বাড়ী’ । কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে । আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, ‘হরি আমার বড় ছুঁই হ’য়েছে’, ‘আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না ।’ ‘আমার হরি’ মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে ।

“তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই । তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর ; জেনো যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয় ; এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে । আর বলি যে, তাঁর পাদ-পদ্মে ভক্তির জন্ম ব্যাকুল হ’য়ে সর্বদা প্রার্থনা ক’রবে ।”

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল । একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয় ! আজ-কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ কথা মানেন না ।

প্রতাপ । মুখে যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না । এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেককেই মানতে হ’য়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হ’লেই হ’লো ; শক্তিতো মান্ছে ? নাস্তিক কেন হবে ?

প্রতাপ । তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সং-কার্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়, এ কথা) ও মানেন ।

* * * *

অনেক কথাবার্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোথান করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) । আর কি বলবো তোমায় ? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকে না !

“আর এক কথা কামিনীকাকুনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে । সে দিকে যেতে দেয় না । এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে স্মৃত্যাত করে (সকলের হাশু) । তা ভালই হোক আর মন্দই হোক । যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, ‘আজ্ঞে খুব ভাল’—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাননভাগের কথা, সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু-সংঘাতে তুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল; কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

প্রতাপ চলিয়া গেলে কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলিতেছেন—“মহাশয় এই বেলা দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করুন। আজ সেখানে কেশব সেনের মা ও বাড়ীর মেয়েরা আপনাকে দর্শন ক’রতে যাবেন। তাঁরা আপনাকে না দেখতে পেলে হয়’ত দুঃখিত হ’য়ে ফিরে আসবেন।”

কয়মাস হইল কেশব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী, পরিবার ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি)। রোসো বাপু, একে আমার ঘুম-টুম্ হয় নাই;—তাড়াতাড়ি ক’রতে পারি না। তারা গেছে তা আর কি ক’রবো! আর সেখানে তারা বাগান বেড়াবে, চ্যাড়াবে—বেশ আনন্দ হ’বে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর যাত্রা করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যাইবার সময় ঠাকুর সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন। সব ঘরে এক একবার যাইতেছেন আর মৃদুমৃদু নামোচ্চারণ করিতেছেন। কিছু অসম্পূর্ণ রাখিবেন না। তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন—‘আমি তখন হুচি খাই নাই, একটু হুচি এনে দাও।’ কণিকামাত্র লইয়া খাইতেছেন। আর বলিতেছেন—‘এর অনেক মানে আছে। হুচি খাই নাই মনে হ’লে আবার আসবার ইচ্ছা হ’বে। (সকলের হাস্য।)

মণি মল্লিক (সহাস্যে)। বেশ’ত আমরাও আসতাম।

ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

একাদশ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

25th June, 1884.

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিত* দর্শন ।]

আজ রথযাত্রা । বুধবার, ২৫এ জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি । সপ্তদশবর্ষ অতীত হইল । সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন । ঠন্থনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসনবাটী সেখানে আসিয়া ঠাকুর শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রাটে চাটুর্ঘ্যোদের বাড়ী, রহিয়াছেন । পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা । বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । ঈশানের পরিচিত ভাটপাড়ার দুই একটা ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে একজন ভাগবতের পণ্ডিত । ঠাকুরের সঙ্গে হাজরা ও আরও দুই একটা ভক্ত আসিয়াছেন । বেলা প্রায় ১০টা হইবে । ঈশানের শ্রীশ প্রভৃতি ছেলেরাও উপস্থিত আছেন । একজন ভক্ত শক্তির উপাসক আসিয়াছেন । কপালে সিন্দুরের কোঁটা । ঠাকুর আনন্দময় সিন্দুরের টিপ দেখিয়া ঐ ভক্তটী সম্বন্ধে হাসিতে হাসিতে বালতেছেন,—‘উনিত মার্কামারা’ ।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাষ্টার তাহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিলেন । তাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন । ঠাকুর মাষ্টারকে বলিয়াছিলেন আমি অমুক দিন ঈশানের বাড়ী যাইতেছি, তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিবে ।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, সে দিন তোমার বাড়ী যাচ্ছিলাম,—‘তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায় ?’

শ্রীমুত শশধর তর্কচূড়ামণি ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, এখন শ্রামপুকুর তেলিপাড়ায় আছি । স্কুলের কাছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ স্কুলে যাও নাই ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি ।

নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়ীতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে । তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র—ছোট ছোট ভাই ভগ্নী আছে । পিতা উকিল ছিলেন । কিন্তু কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই । সংসার প্রতিপালনের জন্ত নরেন্দ্র কাজ কর্ম চেষ্টা করিতেছেন । ঠাকুর নরেন্দ্রের কর্মের জন্ত ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছেন । ঈশান Comptroller Generalএর অফিসে Superintendent অর্থাৎ কর্মচারীদের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন । নরেন্দ্রের বাটীর কষ্ট শুনিয়া ঠাকুর সর্বদা চিন্তিত থাকেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । আমি ঈশানকে তোরা কথা বলেছি । ঈশান ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে) একদিন ছিল কিনা—তাই বলেছিলাম । তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে ।

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন সেই উপলক্ষে কতকগুলি বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । গান হইবে । পাকোয়াজ বাঁয়া তবলা ও তানপুরা আয়োজন হইয়াছে । বাড়ীর একজন একটা পাত্র করিয়া পাকোয়াজের জন্ত ময়দা আনিয়া দিল । বেলা ১১টা হইবে । ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গান করেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ঈশানের প্রতি) এখনও ময়দা । তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেয়ী !

ঈশান (সহাস্যে) আজ্ঞে না তত দেয়ী নাই ।

ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন । ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটা উদ্ভট শ্লোক বলিতেছেন । শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

ভাগবতের পণ্ডিত । দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর । যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে, তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল এই সব দর্শন শুক বোধ হয় । কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর । সঙ্গীতে পাষণ্ডহৃদয় লোকও গলে যায়, কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে তা হলে কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত ভাল লাগে না । সব মন

ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বুভুক্ষা হয়, যখন ক্ষুধা পায়, তখন কাব্য গীত নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্তিম চমৎকারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ইনি রসিক।

পাখোয়াজ্ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রী শ্ৰী। বৈঠকখানা ঘর রাস্তার উপর। ঈশানের শ্বশুর ৮ক্ষেত্রনাথ চাটুর্ঘ্য মহাশয় এই বৈঠকখানা ঘর করিয়াছিলেন।

মাষ্টার শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—‘ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শাস্ত্র প্রকৃতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গে বরাবর পড়িয়াছিলেন। ইনি ওকালতি করেন।’

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ রকম লোকের উকিল হওয়া!

মাষ্টার। ভুলে ওঁর ও পথে যাওয়া হ’য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি গনেশ উকিলকে দেখেছি। ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে) বাবুদেব সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়। পাশাপাশি যায়—হুম্মর নয়, তবে গান ভাল। আমায় কিন্তু বড় মানে; সরল।

(শ্রীশের প্রতি)। আপনি কি সার মনে করেছেন?

শ্রীশ। ঈশ্বর আছেন আর তিনিই সব ক’রছেন। তবে তাঁর গুণ (Attributes) আমরা যা ধারণা করি তা ঠিক নয়। মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা ক’রবে। অনন্ত কাণ্ড!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি, প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।

“তুমি মদ খেতে এসেছ, শুঁড়ির দোকানে কত মদ এ খপরে তোমার কাজ কি। এক গেলাস হ’লেই তোমার হ’য়ে যায়। তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার।

“তাঁর গুণ কোট বৎসর বিচার ক’রলেও কিছু জানতে পারবে না।”

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। ভাট-পাড়ার একটি ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। সংসারে কিছু নাই। এঁর (ঈশানের)।

সংসার ভাল তাই,—তা না হ'লে যদি ছেলেরা রাঁড়খোর, গাঁজাখোর, মাতাল, অবাধ্য এই সব হ'তো তা হ'লে কষ্টের একশেষ হ'তো । সকলের ঈশ্বরের দিকে মন,—বিচার সংসার এরূপ প্রায় দেখা যায় না । ছ' চারটে বাড়ী দেখলাম—কেবল ঝগড়া, কৌদল, হিংসা, তার পর রোগ, শোক, দারিদ্র্য । দেখে বললাম—মা, এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও ।

“দেখনা নরেন্দ্র, কি মুকিলেই পড়েছে । বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না—কাজ কর্মের এত চেষ্টা ক'রছে, জুটছে না—এখন কি করে বেড়াচ্ছে জাথো ।

(মাষ্টারের প্রতি) । মাষ্টর, তুমি আগে অতো যেতে, এখন তত যাওনা কেন ? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে !

“তা দোষই বা কি ? চারদিকে কামিনী কাঞ্চন ! তাই বলি, ‘মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী ক'রোনা ।”

ভাটপাড়ার বামুন । কি ! গৃহস্থ ধর্মের সূখ্যাতি আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ ; কিন্তু বড় কঠিন ।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমরা কি অন্ধ্যায় ক'বলাম ? ওরা গাচ্ছে—নরেন্দ্র গাচ্ছে—আর আমরা সব পালিয়ে এলাম !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন । তাঁহার অতি কোমলাঙ্গ । অতি সস্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত । তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়—প্রায় গাড়ী না হ'লে অল্প দূরও যাইতে পারেন না । গাড়ীতে উঠিয়াই ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন । তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে । বর্ষাকাল ; আকাশে মেঘ ; পথে কাদা । ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন । তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে ।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল । দ্বারদেশে গৃহস্থামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন ।

উপরে যাইবার সিঁড়ি । তৎপরে বৈঠকখানা । উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন । পণ্ডিতকে

দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বর্ণ উজ্জল গৌর বলিলে, বলা যায় । গলায় কুজাকের মালা । তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন । তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন । ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন । সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন । নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন । হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছেন । ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ ! বেশ ! পরে পণ্ডিতকে বলিতেছেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেকচার দাও ?

শশধর । মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি ।

[কলিতে ভক্তিযোগ কর্মযোগ নহে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া ভক্তি । শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কে ? আজকালকার জরে দশমূল পাঁচন চলে না । দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায় । আজকাল 'কিবার মিক্চার' কর্ম করিতে যদি বল,—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'লবে । আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোখত্তা' ও সব অত ব'লতে হবে না । তোমাদের গায়ত্রী জপ'লেই হবে । কর্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্মী দুই এক জনকে ব'লতে পার ।

[বিষয়ী লোক ও লেকচার ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করিতে পারবে না । পাখরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায় ? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না । তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে ? সাধুর কমণ্ডলু (তুফা) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো । তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হ'চ্ছে না । তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে । বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না ! মাঝে মাঝে প'ড়ে যায়, আবার দাঁড়ায় ;—তবে তো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে ।

[নবানুরাগ ও বিচার ।]

“কে ভক্ত কে বিষয়ী তুমি চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়।
প্রথম বাড় উঠলে কোন্টা তেঁতুল গাছ, কোন্টা আম গাছ, বুঝা যায় না।

[কর্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ ; যোগ ও সমাধি ।]

“এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ’লে কেউ একবারে কর্মত্যাগ ক’রতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার ‘ওঁ রাম’ ব’লতে যদি চক্ষে জল আসে, তা’হলে নিশ্চয় কোনো যে, তোমার কর্ম শেষ হ’য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম ক’রতে হবে না।

‘ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল ; কর্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ’লে বেশী কর্ম ক’রতে পারে না। ষাণ্ডী দিন দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস প’ড়লে, ষাণ্ডী প্রায় কর্ম ক’রতে দেয় না। ছেলে হ’লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে ; আর কর্ম ক’রতে হয় না।

“সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং,—ট-অ-ম্। যোগী নাদভেদ ক’রে পরব্রহ্মে লয় হন।

“সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[পাণ্ডিত্য ও সাধন । পাণ্ডিত্য ও বিবেক বৈরাগ্য ।]

‘সমাধি’ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহুজ্ঞান নাই। মুখে একটা কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগতের নাথকে দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহুজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা ! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার ব’লেছিলাম, ‘মা ! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখ বো’ ; তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বাবা ! আর একটু বল বাড়াও !

আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! তবে তুমি লোকের ভালর জন্ত এ সব ক'রছ।

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।

ঠাকুর আরও বলিলেন, “যখন প্রথমে তোমার কথা শুন্লুম, তখন জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?”

[আদেশ ও আচার্য্য ।]

“যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

“যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

“বাখাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা'হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

“প্রদীপ জ্বাললে বাতুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্তে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাক্তে হয় না; অমুক সময়ে লেকচার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে, লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে, আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লবেন? আমি সে সকল লোককে বলি, ‘দূর কর—আমার ও সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না’।

“চুষুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? ব'লতে হয় না;—লোহা আপনি চুষুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

“এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা'বোলে মনে করো না যে, তার জ্ঞানের কিছু কম্বতি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে,—ফুরায় না।

“ওদেশে ধান মাপ্রার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকে, যা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

“যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা'হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

হাজরা। হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্থামী । আদেশ পান নাই বটে । কর্তব্যবোধে লেকচার দিচ্ছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচার কি হবে ?

“একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে ব’লেছিল, ‘ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্তাম, তেন কর্তাম ।’ এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি ক’রুতে লাগলো, ‘শালা, বলে কিরে ? মদ খেত !’ এই কথা বলাতে উন্টো উৎপত্তি হ’ল । তাই ভাল লোক না হ’লে লেকচারে কোন উপকার হয় না ।

“বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়াল। বলেছিল, ‘মহাশয়, আপনি প্রচার ক’রুতে আরম্ভ করুন । তা’হলে আমিও কোমর বাঁধি ।’ আমি বললাম, ওগো একটা গল্প শোন । ওদেশে হালদার পুকুর ব’লে একটা পুকুর আছে । যত লোক তার পাড়ে বাহে ক’রুতো । সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত । কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ’ত না ; আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহে ক’রেছে, লোকে দেখতো । কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী পুকুরের কাছে একটা হুকুম মেয়ে দিল ; কি আশ্চর্য্য, একবারে বাহে করা বন্ধ হ’য়ে গেল ।

“তাই বলছি, হেঁজি পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না । চাপরাস থাকলে তবে লোক মানবে । ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোক-শিক্ষা হয় না । যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই ! কলকাতায় অনেক হুমানপুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমায় লড়তে হ’বে । এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠা !

“চৈতন্যদেব নিজে অবতার । তিনি যা ক’রে গেলেন তারই কি র’য়েছে বল দেখি ? আর যে আদেশ পায় নাই, তা’র লেকচারে কি উপকার হবে ?

[কি রূপে আদেশ পাওয়া যায় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই ব’লছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে যগ্ন হও । এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন ।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন ।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম-রত্নধন ॥ (৬৩ পৃষ্ঠা ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ সাগরে ডুবলে মরে না ;—এ যে অমৃতের সাগর !

[নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর ।]

“আমি নরেন্দ্রকে ব’লেছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র ; তুই এ সমুদ্রে ডুব্

দিবি কি না বল। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে এক খুলি রস র'য়েছে, আর তুই মাছি হ'য়েছিস। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল? নরেন্দ্র ব'লে, আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'বো; কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে। তখন আমি ব'ললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি ক'রতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই, তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্ন হও।

“ঈশ্বর লাভ হ'লে ডাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হ'বে।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ঈশ্বর লাভের নানা পথ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ ।

“যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে;—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় খাচ্চা মেরে কেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আশ্বাদন করলেই তুমি অমর হবে।

“অনন্ত পথ;—তার মধ্যে জ্ঞান, কৰ্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে, ঈশ্বরকে পাবে।

“মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—‘জ্ঞানযোগ,’ ‘কৰ্মযোগ,’ আর ‘ভক্তিযোগ।’

১। জ্ঞানযোগ;—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদস্য বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। কৰ্মযোগ;—কৰ্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ।

“অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কৰ্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কৰ্ম করে, সেও কৰ্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কৰ্ম করার নামও কৰ্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কৰ্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগ ;—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখা । কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ । ভক্তিযোগই যুগধর্ম ।

“কর্মযোগ বড় কঠিন । প্রথমতঃ, আমি আগেই ব'লেছি, সময় কৈ ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম ক'রতে ব'লেছে, তার সময় কৈ ? কলিতে আয়ু কম ।

“তার পর অনাসক্ত হ'য়ে, ফলকামনা না ক'রে, কর্ম করা ভারি কঠিন । ঈশ্বর লাভ না ক'রলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না । তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে ।

“আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন । জীবের একে অম্লগত প্রাণ ; তাতে আবার আয়ু কম । তার পর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না । এ দিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না । জানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম ; আমি শরীর নই ; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার ।

“যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জানী কেমন ক'রে হবে ? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে,—অথচ ব'লছে, কৈ হাত তো কাটে নাই ! আমার কি হ'য়েছে ?

[ভক্তিযোগই যুগধর্ম ; জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ নহে ।]

“তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ । এতে অগ্রাগ্র পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় । জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অগ্রাগ্র পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন ।

“ভক্তিযোগ যুগধর্ম—তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে ; জানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে । এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধ'রেও যান, তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক'রবেন । ভক্তবৎসল মনে ক'রলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন ।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ?]

“ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না । তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঈশ্বরের অধিকারী করেন । ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন ।

“কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তা হ'লে গড়ের মাঠ, মুসাইট (Asiatic Society's Museum) সবই দেখতে পায় ।

“কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আসি ।

“জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, — তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

[ভক্ত ও কৰ্ম্ম ; ভক্তের প্রার্থনা ।]

“ভক্ত বলে “মা, সকাম কৰ্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কৰ্ম্মে কামনা আছে। সে কৰ্ম্ম ক’রলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হ’য়ে কৰ্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কৰ্ম্ম ক’রতে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কৰ্ম্ম কাজ নাই। যত দিন না তোমায় লাভ ক’রতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কৰ্ম্ম কমে যায়। যে টুকু কৰ্ম্ম থাকবে, সে টুকু কৰ্ম্ম যেন অনাসক্ত হ’য়ে করতে পারি; আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত দিন না তোমায় লাভ ক’র্তে পারি, ততদিন যেন নূতন কৰ্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ ক’রবে তখন তোমার কৰ্ম্ম ক’রবো, নচেৎ নয়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

পণ্ডিত । মহাশয়ের তীর্থে কত দূর যাওয়া হ’য়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্ত্রে) হাজার। অনেক দূর গিছল; আর খুব উচুতে উঠেছিল। স্বর্ষীকেশ গিছল। (সকলের হাস্ত)। আমি অত দূর যাই নাই, অত উচুতেও উঠি নাই। (সকলের হাস্ত)।

“চিল শকুনিও অনেক উচ্ছে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্ত)। ভাগাড় কি জান ? কামিনী ও কাঞ্চন।

“যদি এখানে ব’সে ভক্তি লাভ করতে পার, তা হ’লে তীর্থ যাবার কি দরকার ? কাশী গিয়ে দেখলাম সেই গাছ ! সেই তেঁতুলপাতা !

“তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ’লো, তা হ’লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ’ল না। আর ভক্তিই সার, আর এক মাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান ? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কৰ্ম্ম ক’রতে বলেছে, আমরা অনেক ক’রেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্মান, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত !”

পণ্ডিত । আচ্ছা হাঁ । মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে অণু হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানোও তা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও—সময় না হ'লে ফল হবে না । ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে ব'লে 'মা ! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও ।' মা ব'লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেব না ।' (সকলের হাস্য) ।

“সেইরূপ ভগবানের জন্ত ব্যাকুল হওয়া । ঠিক সময় হ'লেই হয় ।

[আচার্য্যের তিন শ্রেণী । পাত্রাপাত্র ।]

“তিন রকম বৈজ্ঞ আছে ।

“এক রকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায় । কেবল রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে । এরা অধম থাকের বৈজ্ঞ ।

“সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা দেখে না । তাঁর জন্ত ভাবেনা ।

“কতকগুলি বৈজ্ঞ আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে । রোগী যদি খেতে না চায়, তাঁকে অনেক বুঝায় । এরা মধ্যম থাকের বৈজ্ঞ । সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে । তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝান, যা'তে তাঁরা উপদেশ অনুসারে চলে ।

“আবার উত্তম বৈজ্ঞ আছে । যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা হ'লে তারা জোর পর্য্যন্ত করে । যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয় । সেইরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে । তাঁরা শ্বরের পথে আনুবার জন্ত শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন ।”

পণ্ডিত । মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি, সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না এ কথা ব'ললেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সত্য বটে । কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ'লে বৈজ্ঞ কি ক'রবে ? উত্তম বৈজ্ঞও কিছু ক'রতে পারে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয় । তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না । আমার কাছে কেহ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার কে আছে ?' মনে কর, বাপ নাই, হয় তো বাপের ঋণ আছে, তা হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক ? শুনু ছো বাপু ?

পণ্ডিত । আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি ।

[ঈশ্বরের দয়া ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এসেছিল । মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল । একজন ব'ললে, 'ঈশ্বর দয়াময় ।' আমি ব'ললাম, 'বটে ? সত্য না কি ? কেমন ক'রে জানলে ?' তারা বললে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন,—এত যত্ন ক'চ্ছেন ।' আমি ব'ললাম, 'সে কি আশ্চর্য্য ? ঈশ্বর যে সকলের বাপ ! বাপ ছেলেকে দেখবে না ত কে দেখবে ? ও পাড়ার লোক এসে দেখবে না কি ?'

নরেন্দ্র । তবে ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লবো না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে কি আমি দয়াময় ব'লতে বারণ ক'রছি ? আমার ব'লবার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন ।

পণ্ডিত । কথা অমূল্য !

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি ।) তোমার গান শুনিছিলুম—কিন্তু ভাল লাগলো না । তাই উঠে গেলুম । বললুম উমেদারি অবস্থা—গান আলুনি বোধ হ'লো ।

নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল । তিনি চুপ করিয়া রহিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

[বিদায় ।]

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন । তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল । সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন । পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল ।

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি) । আপনারা ইহার সঙ্গে রাত দিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (হাসিতে হাসিতে) । আজ আমার খুব দিন ! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম । (সকলের হাস্য) । দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান ? 'সীতা' রাবণকে ব'লেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ ।' রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসি । সীতার ব'লবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে । রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে !

এই বলিয়া ঠাকুর গাজোখান করিলেন । বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন । ঠাকুর ভক্তগণ সমভিষাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঈশানের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন । এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন । ভক্তেরা কেহ কেহ আছেন । ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা সকলে উপস্থিত আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহস্রো ঈশান প্রভৃতির প্রতি) । শশধরকে বল্লম, গাছে না উঠতে এক কাঁদি—আরও কিছু সাধন ভজন কর, তার পর লোক-শিক্ষা দিও ।

ঈশান । সকলেই মনে করে যে আমি লোক-শিক্ষা দিই । জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি । তা একজন বলেছিল ‘হে জোনাকি পোকা তুমি আবার আলো কি দেবে !—ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) । কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয় ;—একটু বিবেক বৈরাগ্য কাছে ।

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতটিও এখনও বসিয়া আছেন । বয়স ৭০।৭৫ হইবে । তিনি ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন ।

ভাগবতপণ্ডিত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনি মহাত্মা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব এদের ব’লতে পারেন ; আমি আপনার সন্তানের ন্যায় ।

“তবে একহিসাবে ব’লতে পারেন । এম্মি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে ব’য়ে নিয়ে বেড়ায় । (সকলের আনন্দ) । ভক্ত ‘মোরে দেখে হীন, অপনাকে দেখে বড় ।’ যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিচ্ছিলেন—যশোদার বিশ্বাস এই ছিল যে আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তাকে কে দেখবে ।

“কখনও ভগবান চুমুক পাথর, ভক্ত ছুঁচ্,—ভগবান আকর্ষণ ক’রে ভক্তকে টেনে নেন । আবার কখনও ভক্ত চুমুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ্ হন,—ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হ’য়ে ভগবান তাঁর কাছে গিয়ে পড়েন ।”

এইবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন । নীচের বৈঠকখানার দক্ষিণ-দিকে যে বারাণ্ডা তাহাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন । ঈশান প্রভৃতি ভক্তরাও দাঁড়াইয়া আছেন । ঈশানকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলো অনেক উপদেশ দিতেছেন ।

শ্রী রামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) । সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত । ভগবান বলেন যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সেত' আমায় ডাকবেই, আমার সেবা ক'রবেই—তার আর বাহাদুরী কি ? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছিছি ক'রবে । আর যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকে—বিশমণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেইই ধন্য, সেইই বাহাদুর—সেইই বীরপুরুষ ।

ভাগবতের পণ্ডিত । শাস্ত্রে ত ঐ কথাই আছে । ধর্মব্যাতের কথা আর পতিব্রতার কথা । তপস্বী মনে ক'রেছিল যে আমি কাক আর বককে ভস্ম ক'রেছি অতএব আমি খুব উঁচু হ'য়েছি । সে পতিব্রতার বাড়ী গিছলো । তার স্বামীর উপর এত ভক্তি যে দিনরাত স্বামীর সেবা—এমনকি স্বামী বাড়ীতে এলে পা ধোবার জল আর মাথার চুল দিয়ে তার পা পুঁছে দিত । তপস্বী অতিথি, ভিক্ষা পাওয়ায় দেবী হচ্ছিল তাই—চোঁচিয়ে বলেছিল যে তোমাদের ভাল হ'বে না । পতিব্রতা অমনি দূর থেকে বোললে 'এতো কাকী বকী ভস্ম করা নয় । একটু দাঁড়াও ঠাকুর, তুমি স্বামীর সেবা ক'রে তোমার পূজা ক'রছি' ।

“ধর্মব্যাতের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম গিছলো । সে ব্যাধ—পশুর মাংস বিক্রী ক'রতো কিন্তু রাতদিন ঈশ্বর জ্ঞানে বাপ মার সেবা ক'রতো । যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম তার কাছে গিছলো সে দেখে অবাক,—ভাবতে লাগলো 'এ ব্যাধ মাংস বিক্রী করে, আর সংসারী লোক । এ আবার আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দিবে ।' কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণ জ্ঞানী ।

ঠাকুর এইবার গাড়ীতে উঠিবেন । পাশের বাড়ীর (ঈশানের শ্বশুর বাড়ীর) দরোজায় দাঁড়াইয়াছেন । ঈশান ও ভক্তেরা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন । ঠাকুর আবার কথাগুলো ঈশানকে উপদেশ দিতেছেন ।

“পিঁপড়ের মত সংসারে থাক । এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হ'য়ে—চিনিটুকু নেবে ।

“জলেতুধে একসঙ্গে রয়েছে । চিদানন্দরস আর বিষয়রস । হৃৎসের মত দুখটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ ক'রবে ।

“আর পানকোটের মত । গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে । আর পাকাল মাছের মত । পাকে থাকে কিন্তু গা দেখে পরিষ্কার উজ্জল ।

“গোলমালে 'মাল' আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে ।

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিতেছেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথায়ুত ।

দ্বাদশ খণ্ড ।

সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ
গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ
ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ ।

19th OCTOBER, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[‘সমাধি-মন্দিরে’ ।]

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন । ৮কালী
পূজার পরদিন, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরেজী ১৯এ অক্টোবর,
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । এবার শরতের মহোৎসব । শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের
মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল । প্রাতঃকালের
উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে । শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময়
আসিয়া পহঁছিলেন । তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল । অমনি
দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন । প্রথম
প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে । তাহার সম্মুখে দালান । সেই
দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন । অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন
করিয়া বসিলেন । বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন ।
তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়াল (Sub-Judge) ও আছেন ।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে । কোথাও
নানাবর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হর্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন,
সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব । সম্মুখে পূর্বপরিচিত সেই সরোবরের
স্বচ্ছসলিলমধ্যে শরতের সুনীল নভে মণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে । উদ্যানস্থিত
রাসা রাসা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্বপরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী ।
আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাই-

বেন—যে ধনি আধ্যাত্মবিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধনি আর একবার নররূপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের হৃৎথে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার, হরিপ্রেমবিহ্বল, ঈশার (Jesusএর) মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরঙ্কর মৎস্যজীবীগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধনি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু-প্রমুখাৎ যে মেঘ-গম্ভীর ধনি মধ্যে বিনয়নম্র, ব্যাকুল ‘গুড়াকেশ’ কোন্তেয় এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন,—

কবিং পুরাণম্ অমুশাসিতারম্, অণোরণীয়াণ্ সমুস্মরেৎ যঃ
সৰ্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
প্রয়াণ-কালে মনসাহচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ক্রবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সমাক্, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥
যদঙ্করং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, বিশস্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন । বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র । দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সৰ্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে । আদলতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে, ও জজ্ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটা তোমার বেশ, ‘দেমা পাগল করে,’ ঐটা গাও না । তিনি গাহিতেছেন,—

আমায় দে মা পাগল ক’রে (ব্রহ্মময়ি) ।
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত-হরা ডুবাও প্রেমসাগরে ॥
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভাণ্ডা ।

ঈশা যুস। শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে ॥

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেল।

প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ।

তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,

প্রেমধনে কর মা ধনী, কাকাল প্রেমদাসেরে ॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে লম্বাধিহ—‘উপেক্ষিয়া মহত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে ।’ কর্মেজিয়, জ্ঞানেজিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুস্তলিকার ন্যায় বিচ্যমান। একদিন ভগবান্ পাণ্ডবমাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতাস্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাদিয়াছিলেন। তখন আর্যাকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায়া শায়িত থাকিয়া অস্তিত্বকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজেই কাদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্ৰাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাদিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[হরিকথা প্রসঙ্গে ।]

কিয়ৎকণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্বের ঠিক সহজাবস্থা।

[আমি সিদ্ধি খাব। গীতা ও অষ্টসিদ্ধি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা! কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

“সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। ‘অষ্টসিদ্ধি’র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ‘তাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তা’হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেন না, সিদ্ধাই থাকলেই অহংকার থাকবে, আর অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।’

[ঈশ্বর লাভ কি ?]

“আর এক আছে, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে

ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক । সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে । সাধক, আরো এগিয়ে গেছে । তার লোক দেখান ভাব কমে যায় । সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে । সিদ্ধ কে ? যাঁর নিষ্ঠায়াত্মিক বুদ্ধি হয়েছে, যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'রছেন ; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রছেন ! 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে ? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন । শুধু দর্শন নয় ; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ।

“কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস ; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শাস্তি আর তৃপ্তিলাভ করা ; দুটি ভিন্ন জিনিষ ।

ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না । তারে বাড়ি, তারে বাড়ি আছে ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকারবাদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) । এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী । তা বেশ ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) । একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে । দৃঢ় হ'লে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না । দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'রবে । মিছরীর রুটী সিঁদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে । (সকলের হাস্য) ।

[বিষয়ীর ঈশ্বর ; ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ ।]

“কিন্তু দৃঢ় হ'তে হ'বে ; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে । বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান ? যেমন খুড়ী জেঠীর কৌদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য' । আর যেমন কোন ফিট বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, হাতে ষ্টিক্ (stick) ক'রে, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে ;—'ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে !

“একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে । ডুব দাও । না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না । জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।”

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মনমুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে—গাইতে লাগিলেন । সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন ।

গান ।

ডুব, ডুব, ডুব, রূপসাগরে আমার মন ।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ॥ (৬৩ পৃষ্ঠা)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে ।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ডুব দাও । ঈশ্বরকে ভালবাস্তে শেখ । তাঁর প্রেমে মগ্ন হও । দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি । কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন ? ‘হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, নক্ষত্রলোক, সব ক’রেছ,’—এ সব কথা আমাদের অতো কাজ কি ?

“সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক ; কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক’জন ? বাবুকে খোঁজে দুই একজন । ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ’য়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক’ছি । সত্য ব’লছি দর্শন হয় ! একথা কারেই বা ব’লছি, কে বা বিশ্বাস করে !

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law or Revelation) ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? শাস্ত্র প’ড়ে হৃদ অস্তিমাত্র বোধ হয় । কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না । ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয় । বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ’য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধ’রতে পারবে না ! শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না ।

“শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে ? তাঁর কৃপা না হ’লে কিছু হবে না, যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ’য়ে তার চেষ্টা করো । কৃপা হ’লে তাঁর দর্শন হবে । তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন ।”

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য ; 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ ।']

সদরওয়াল। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি এক জনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম ? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি ! ঘোড়াটাও টা আর সুরাটাও টা ! তুমি যা বল্ছে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা ব'লেছিল। ব'লেছিলে, মহাশয়, তিনি কি কারকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারকে কম দিয়েছেন ? আমি ব'ললাম, বিভূরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরেও যেমনি পীপ্‌ড়েটির ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি ! তোমার কি ছোটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি ! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

“যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেণবকে এতো মানতো কেন ?

“গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জগুই হউক, বা গাওনা বাজনার জগুই হউক, বা লেকচার্ (Lecture) দেবার জগুই হউক, বা আর কিছুর জগুই হউক—নিশ্চিত জেন যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।”

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। যা বলছেন মেনে নেন না !

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি) তুমি কি রকম লোক ! কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া ! কপটতা ! তুমি ঢং কাচ দেখছি !

ব্রাহ্মভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কেশব ও নিলি'প্ত সংসার ;

সংসার-ত্যাগ ।]

সদরওয়াল। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'রতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন ক'রতে হবে ? সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিন কতক নিজ্জনে থাকতে হয়। নিজ্জনে থেকে

ঈশ্বরের সাধনা ক’রতে হয় । বাড়ীর কাছে এমন একটি আড্ডা ক’রতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার । কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব ব’লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত । আমি বল্লুম, জনক রাজা অমনি মুখে বল্লেনই হওয়া যায় না । জনক রাজা হেটমুও হ’য়ে আগে নির্জনে কত তপস্বী ক’রেছিল ! তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক রাজা হবে । অমুক খুব তর তর ক’রে ইংরাজি লিখতে পারে ; তা কি একে-বারেই লিখতে পেরেছিল ? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটা দুটা খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর তর ক’রে লিখতে পারে ।

“কেশবসেনকে আরও ব’লেছিলুম, নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন ক’রে ? রোগটা হ’চ্ছে বিকার । আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল, আর জলের জালা ! তা রোগ সারবে কেমন ক’রে ? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব’লতে ব’লতে আমার মুখে জল এসেছে । (সকলের হাস্য) । সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জান ! মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, আবার ভোগ-বাসনা জলের জালা । বিষয়-ভৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে । এতে কি বিকার রোগ সারে ? দিন কতক ঠাইনাড়া হ’য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই । তারপর নীরোগ হ’য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই । তাঁকে লাভ ক’রে সংসারে এসে থাকলে, আর কামিনী-কাঞ্চনে কিছু ক’রতে পারে না । তখন জনকের মত নিলিপ্ত হ’তে পারবে ।

“কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই । খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই । অশ্বখগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে । কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ’লে আর বেড়ার দরকার হয় না । হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু ক’রতে পারে না । যদি নির্জনেতে সাধন ক’রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ ক’রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, তা’হলে কামিনীকাঞ্চনে তোমার কিছু করতে পা’রবে না ।

“নির্জনে দৈ পেতে মাখম্ তুলতে হয় । জ্ঞানভক্তি রূপ মাখম্ যদি এক-বার মন রূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা’হলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নিলিপ্ত হ’য়ে ভাসবে । কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি

সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তা'হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নিলিপ্ত হ'য়ে ভাসতে পারবে না।

“ঈশ্বরলাভের জন্ত সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, আর এক হাতে কাজ ক'রবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।”

সদরওয়াল। (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি বুঝি একবারে জনক রাজা হ'য়ে প'ড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসার-ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শাস্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ ক'রতে হবে, কেজা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে; খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলো না, তখন ঈশ্বর টিঙ্ক সব ঘুরে যাবে। একজন তাঁর মাগ'কে ব'লেছিল, ‘আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চলুম’। মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে ব'লে, ‘কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্ত দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তা'হলে এই এক ঘরই ভাল।’

‘তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্ত ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটা দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

“জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এঁরা জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন + এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্মের।”

[জ্ঞানীর লক্ষণ।]

সদরওয়াল।। মহাশয়! জ্ঞান যে হয়েছে তা কেমন ক'রে জানবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়াল। মহাশয় ! আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন ?

[ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম ও পাপবাদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি) । ঐ কেবল তোমাদের পাপ আর পাপ ! এ সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত ? আমায় একজন একখান বই (Bible) দিলে । একটু পড়া শুনলাম ; তা তাতে কেবল ঐ এক কথা ! পাপ আর পাপ ! আমি তাঁর নাম ক'রেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি ব'লেছি—আমার আবার পাপ ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই ! নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই ।

সদরওয়াল। মহাশয় ! কেমন ক'রে ঐ বিশ্বাস হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁতে অনুরাগ কর । তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু ! বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা ।' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্ত তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ । মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকমান হ'লে, কি কশ্মের জন্ত, লোকে এক ঘণ্টা কাঁদে, ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদছে বল দেখি ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

“আন্মোক্তারী দাও ।”

ত্রৈলোক্য । মহাশয়, এঁদের সময় কই ; ইংরেজের কর্ম্ম ক'রতে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি) । আচ্ছা তাঁকে আন্মোক্তারী দাও । ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে ? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক । তিনি যা কাজ ক'তে দিয়েছেন, তাই ক'রো ।

‘বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই । মা মা করে । মা যদি হেঁসালে রাখে সেইখানেই প'ড়ে আছে । কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে । আবার মা যখন গৃহস্থের বিছানার উপর রাখে, তখনও সেই ভাব । মা মা করে ।

সদরওয়াল। আমরা গৃহস্থ, কত দিন এ সব কর্তব্য ক'রতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি ? ছেলেদের মানুষ ক'রতে হ'বে । স্ত্রীকে ভরণপোষণ ক'রতে হবে ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখতে হবে । তা যদি না কর, তুমি নির্দয় । দয়া শুকদেবামি রেখেছিলেন । দয়া যার নাই, সে মানুষই নয় ।

সদরওয়াল।। সন্তান প্রতিপালন কত দিন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ।। সাবালক হওয়া পর্যন্ত । পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে খাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না ।

(সকলের হাস্য) ।

[গৃহস্থের কর্তব্য ; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্তব্য ।]

সদরওয়াল।। জ্ঞীর প্রতি কি কর্তব্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণ।। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণপোষণ ক'রবে । যদি মতী হয়, তোমার অবর্তমানে খাবার যোগাড় ক'রতে হবে ।

“তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না । তখন কালকার জন্ত তুমি না ভাবলে ঈশ্বরে ভাবেন । জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তিনি তোমার পরিবার-দের জন্ত ভাববেন । যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অচ্ছী সেই নাবালকের ভার লয় ।

(সদরওয়ালার প্রতি) । “এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো ?”

সদরওয়াল।। আজ্ঞা হাঁ ।

বিজয় গোস্বামী।। আহা ! আহা ! কি কথা ! যিনি অনন্তমন হ'য়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন ! নাবালকের অমনি ‘অচ্ছী’ এসে জোটে ! আহা কবে সেই অবস্থা হবে ? ষাঁদের হয় তাঁরা কি ভাগ্যবান !

ত্রৈলোক্য।। মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয় ? ঈশ্বর লাভ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ।। (হাসিতে হাসিতে) । কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো । (সকলের হাস্য) । ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো । কেন সংসারে হবে না ? অবশ্য হবে ।

[জ্ঞানীর লক্ষণ ; জীবমুক্ত ।]

ত্রৈলোক্য।। সংসারে জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার লক্ষণ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ।। হরিনামে ধারা আর পুলক । তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়বে ।

“যত ক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না । বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায় ; আর দেহবুদ্ধি কমে । বিষয়াসক্তি একবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয় । নারি-

কেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয় । জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে নড় নড় করে ; শাঁস আলাদা হ'য়ে যায় । একে বলে খোড়ো নারিকেল । ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়—দেহাশ্রবুন্ধি চ'লে যায় । দেহের সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না । সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না । জীবমুক্ত হ'য়ে বেড়ায় । 'কালীর ভক্ত জীবমুক্ত নিত্যানন্দময় ।'

“যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চ'লে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে । দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্লেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে । আর যদি ভিজ্জ হয়, পঞ্চাশটা ঘস্লেও কিছু হয় না । কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায় । বিষয় রসে র'সে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজ্জ থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না । হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম । বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয় ।”

[উপায় ব্যাকুলতা ;—আপনার মা ।]

ত্রৈলোক্য । বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো । তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে ; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চ'লে যাবে । আপনার মা বোধ থাকিলে এক্ষণই হয় । তিনি তো ধর্ম্ম-মা নন । তিনি আপনারই মা ! ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আদ্যার কর । ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্ত মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রছে । প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না । বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষণই ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড কর্বি ।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, তখন মা অণ্ড মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শাস্ত ক'রে আসি ।' এই কথা ব'লে চাবিটা নিয়ে কড়াং কড়াং ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয় । তোমরাও মার কাছে আদ্যার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন । আমি শিখদের (Sikhs) ঐ কথা বলেছিলাম । তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসেছিল ; মা-কালীর মন্দিরের সমুখে ব'সে তাদের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল । তারা ব'লেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়', আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কিসে দয়াময় ? তারা ব'লে, 'কেন মহারাজ ! তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ সব দিচ্ছেন, আহা

যোগাচ্ছেন' । আমি ব'ল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর, তাদের খাওয়ার ভার বাপে নেবে না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে নেবে ?

সদরওয়াল। মহাশয় ! তিনি কি তবে দয়াময় ন'ন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা কেন গো ? ও একটা ব'ল্লুম ; তিনি যে বড় আপনার লোক ! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে । আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে, শালা ?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

[অহঙ্কার ও সদরওয়াল ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (সদরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার, জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয় ?

“অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় । এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না । ‘আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল’ ।

“অহঙ্কার করা বৃথা । এ শরীর, এ ঐশ্বর্য, কিছুই থাকবে না । একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল । প্রতিমার সাজ গোজ দেখে ব'ল্ছে, মা, যতই সাজো গোজ, দিন দুই তিন পরে তোমার টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে । (সকলের হাস্য) । তাই সকলকে ব'লছি, জজই হও, আর যেই হও, সব দু দিনের জন্ত ! তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ ক'রতে হয় ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য ; লোক ভিন্নপ্রকৃতি ।]

“সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব । তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব । রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায় ; কাপড় পোষাক ফিট ফাট, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queenএর ছবি ; যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী গরদ পরে ; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটা একটা সোণার রুদ্রাক্ষ ; যদি কেউ ঠাকুর-বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর ব'লে, এদিকে আত্মা আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্বেল পাথরের মেজ আছে, ষোল ফোকর নাটমন্দির আছে । আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে । সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শাস্ত ; কাপড় যা তা ; রোজগার পেট চলা পর্য্যন্ত ; কখন

লোকের ভোষামোদ ক'রে ধন নেয় না ; বাড়ীতে মেরামত নাই ; ছেলেদের পোষাকের জন্ত ভাবে না ; মান সম্বন্ধের জন্ত ব্যস্ত হয় না ; ঈশ্বর চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না ; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন । সম্বৎসর সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ । সম্বৎসর এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেবী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে ।

(সদরওয়ালার প্রতি) “তুমি ব'লেছিলে, সব লোক সমান ; এই দেখ, কত ভিন্নপ্রকৃতি !

“আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে ;—(১) নিত্য জীব, (২) মুক্তজীব (৩) মুমুক্শু জীব, (৪) বদ্ধজীব ;—নানা রকম মানুষ । নারদ, শুকদেব এরা সব নিত্যজীব ; যেমন Steam boat (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু হাতি পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায় । নিত্য জীবেরা নায়েবের স্বরূপ ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন ক'রতে যায় । আবার মুমুক্শুজীব আছে, যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে । এদের মধ্যে দুই এক জন জাল থেকে পালাতে পারে, তাদের বলে মুক্তজীব । নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত ; কখন জালে পড়ে না ।

[বদ্ধজীব ।]

“কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁস নাই, তারা জালে প'ড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, একরূপ জ্ঞানও নাই । এরা হরি-কথা সমুখে হ'লে সেখান থেকে চ'লে যায় ;—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন ? আবার মৃত্যুশয্যা শুয়ে, পরিবার কিছা ছেলেদের বলে, ‘প্রদীপে অত সলুতে কেন, একটা সলুতে দাও, তা না হলে তেল পুড়ে যাবে’ ; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাদে আর বলে, হায় ! আমি ম'লে এদের কি হবে !’ আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে ; যেমন উটের কাঁটা-ঘাস খেতে খেতে মুগ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়বে না । এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে ; মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে ; বলে কি ক'রবো অদৃষ্টে ছিল ! যদি তীর্থ ক'রতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুটলী

বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি)। মানুষ কত রকম দেখ; তুমি সব এক বলছিলে। কত ভিন্নপ্রকৃতি! কারু বেশী শক্তি, কারু কম।

[বদ্ধজীব, মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম।]

“সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থ গেলে—কি হবে। সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে; হয়তো বিকারের খেয়ালে ‘হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাত’ বলে চৈচিয়ে উঠলো! শুকপাখী সহজবেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়; ক'্যা ক'্যা করে।

“গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পরলোকে তাই হবে। ভারত রাষ্ট্র ‘হরিণ হরিণ’ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্তে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অল্প সময় ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে। কি আবার এই স্থখদুঃখময় সংসারে আস্তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা করেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে, আবার ধুলা কাদা মাখে! মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর ধুলা কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহ'লে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনীকাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

“ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এতো কৰ্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস ক'রলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।”

* * * *

ব্রাহ্মভক্ত । বেশ কথা হ'লো । অতি সুন্দর কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি এলোমেলো বকলুম ! তবে আমার ভাব কি জান ? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরগী, আমি গাড়ী তিনি Engineer, আমি রথ তিনি রথী ; যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন করান, তেমনি করি ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে ।]

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিলেন । সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল । শ্রীরামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইলেন । সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন ; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহস্র বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন । আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের গ্রায় নৃত্য । বাহুদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আঁখর দিতে লাগিলেন,—

“নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে ;

আপনি নেচে, নাচাও গো মা ;

(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা ;

নাচ গো ব্রহ্মময়ী ;

সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা) ।

সে অপূৰ্ব্ব দৃশ্য ! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য ! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুশ্বকে ধরিয়াছে । সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম, করিতেছেন । অনেকে বালকের মত ‘মা মা’ বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন ।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন । এখনও সমাজের সঙ্ক্যাকালীন উপাসনা হয় নাই । হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় আসিয়া গিয়াছে ! বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদীতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে । রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে ।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন । সম্মুখে বিজয় । বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অত্যাণ্ড মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটা ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন ।

কিয়ৎকালপরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন, “দেখ তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি ! বলে, সংসারের কথা আর বলবেন না ; এক ঢেউ যাচ্ছে, আর একটা ঢেউ আসছে । আমি ব’লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি ! তোমার তো জ্ঞান হয়েছে । তোমার শাশুড়ী তাতে ব’লে, আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে ! এখনও বিভ্রামায়া আর অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই ; শুধু অবিদ্যার পার হলে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হ’তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে । আপনিই তো ও কথা বলেন ।”

এ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বেণীপাল (বিজয়ের প্রতি) । মহাশয়, তবে গাত্রোথান করুন, অনেক দেৱী হ’য়ে গেছে ; উপাসনা আরম্ভ করুন ।

বিজয় । মহাশয়, আর উপাসনার কি দরকার ! আপনাদের এখানে আগে পায়সের ব্যবস্থা, তার পর কড়ার দাল ও অত্যাণ্ড তরকারীর ব্যবস্থা । (সকলের হাস্ত) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে । সন্তোষীভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয় ; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অত্যাণ্ড বলি দেয় ।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদীর উপর বসিবেন কি না ভাবিতেছেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[বিজয়ের প্রতি উপদেশ ।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও লেকচার (Lecture) । আচার্য্যের কার্য্য ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনি অনুগ্রহ করুন, তার পর আমি বেদী থেকে ব’লবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অভিমান গেলেই হ’লো । ‘আমি লেকচার দিচ্ছি, তোমরা

শুন' এ অভিমান না থাকলেই হলো। অহঙ্কান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয় ? যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

“যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আবার মূক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাঙ্গা হাঙ্গা (আমি আমি) করে তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়; আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুতুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুতুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) ব'লতে থাকে—তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাঙ্গা হাঙ্গা (আমি, আমি) ব'লছে না; ব'লছে, তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুবাদ।]

“গুরু, বাবা ও কর্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেমন কাঁটা বেঁধে। আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার ‘বাবা কি ?’ ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

“যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, ‘তুর শালা, গুরু কি রে ?’ এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি)। আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মান্চে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, ‘আমি ব'লছি আর তোমরা শুন।’ এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্য্যন্ত ! ঐ একটু মান; লোকে হদ্দ ব'লবে, ‘আহা, বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী’। ‘আমি ব'লছি,’ এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, ‘মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।’

বিজয় (বিনীতভাবে)। আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বোসবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আমি কি ব'লবো; চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তুমিই তাঁকে বলো যদি আন্তরিক হয়, তা হ'লে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “যাও, যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি করোগে; আন্তরিক তাঁর উপর ভক্তি থাকলেই হোক।”

তদনন্তর বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে

উপাসনা করিতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতেছেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা, সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসন হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবান্কে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

মা ।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সেখানে মাষ্টারও আছেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব । Motherhood of God.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করুছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

“মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আসুছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়ি-ওয়ালা লাঠী হাতে দাঁড়াবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোক জন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে জোর ক’রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তুমুন নালিস চলে না।”

বিজয় । ব্রহ্ম যদি মা, তা হ’লে তিনি সাকার না নিরাকার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আত্মশক্তি) । যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব’লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি ব’লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্চে ছল্চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী ! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী—সাকার নিরাকার।’ তোমাদের যদি নিরাকার ব’লে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দড় ক’রে তাঁর চিন্তা করলে,

তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন । শ্রামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে । তখন জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিত্বমাত্রম্) তা নয় । তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি । বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে । আর একটা কথা--তোমার নিরাকার ব'লে যদি বিশ্বাস হয় তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো । কিন্তু মতুষ্যর বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না । তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না । ব'লো 'আমার, বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন; আমি জানি না, বুঝতে পারি না' । মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ, কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি রূপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে বুঝা যায়; নচেৎ নয় ।

[কালী ও ব্রহ্মে কখন অভেদ ।]

“যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি ।

‘প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে ।

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনা যে মন ঠারে ঠোরে ।’

“আমি তত্ত্ব করি যাঁরে’ । অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব ক'রছি । তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি । আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই ব'ল্ছে,—

“আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি ।’

“অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম । ধর্ম্ম কি না বৈধী কর্ম্ম—এতো দান ক'রতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম ।”

বিজয় । ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুদ্ধ ভক্তি । আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা ! এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ; এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও । দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই । আমি লোকমাগ্নও চাই নাই । ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও আত্মশক্তি ।]

ব্রাহ্মভক্ত । তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ । যেমন মণির ভেদ নাই : আর মণি

অভেদ । মণির জ্যোতিঃ ভাব্লেই মণি ভাব্তে হয় । দুধ আর ছুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ । একটাকে ভাব্লেই আর একটাকে ভাব্তে হয় । কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না । পূর্ণ জ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না । সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না । নেমে একটু আভাসের মত বলা যায় । যখন সমাধি ভঙের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি ! ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না । সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই ।

“যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান ক'রছি', এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি, (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌চো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে । তুমি প্রভু, আমি দাস ; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি মা, আমি ছেলে ; এ বোধ থাকবে । এই ভেদ বোধ ;—আমি একটা, তুমি একটা । এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন ! তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হ'চ্ছে । যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে । তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন । হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না ! আর তিনি ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন ।

“তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে,—ততক্ষণ ব্রহ্ম নিগুণ বলবার যো নাই । ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে । এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আত্মশক্তি ব'লে গেছে ।”

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ।]

বিজয় । এই আত্মশক্তি দর্শন, আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান, কি উপায়ে হ'তে পারে ?
শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো । আর কাদো ! এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে । তখন নিম্নলিখিত জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে । ভক্তের আমিরূপ আসীতে সেই সগুণব্রহ্ম আত্মশক্তি দর্শন ক'রবে । কিন্তু আসী খুব পৌছা চাই । ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না !

“যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, আর সূর্যকে দেখবার কোন-রূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য । যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য । সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আত্মশক্তি ।”

“ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ’রে সত্য সূর্য্যের দিকে যাও ।
সেই সগুণব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনে ঠারেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান
দিবেন । কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নিগুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি
তিনিই ব্রহ্ম । পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ ।

“মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন । কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না । আর
এক পথ, জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ । ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা
ভক্ত । যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ !
আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বিদেষ ভাব ।]

“তিনি অন্তর্যামী ! তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর ।
তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন । অহঙ্কার ত্যাগ ক’রে তাঁর শরণাগত হও ;
সব পাবে ।

আপনাতে আপনি থেক মন, যেও না কো কার ঘরে !

যা চাবি তা ব’সে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে ।

পরম ধন ঐ পরশমণি ; যা চাবি তা দিতে পারে ;

কত মণি প’ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ ছুয়ারে ।”

“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে ; মিশে
যেন এক হ’য়ে যাবে—বিদেষ ভাব আর রাখবে না । ‘ও ব্যক্তি সাকার মানে,
নিরাকার মানে না ; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ; ও হিন্দু ও মুসলমান
ও খৃষ্টান’ এই ব’লে নাক সিঁটকে ঘৃণা ক’রো না । তিনি যাকে যেমন বুঝিয়ে-
ছেন । সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যত
দূর পার । আর ভাল বাসবে । তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ
ক’রবে । ‘জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না ।’ নিজের ঘরে স্বস্বরূপকে
দেখতে পাবে ।

“রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ’য়ে যায় ।
এক পালের গরু । আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার
পৃথক হ’য়ে যায় । নিজের ঘরে ‘আপনাতে আপনি থাকে ।’”

[সন্ন্যাস ও সঙ্ঘ ; অর্থের সদ্যবহার ।]

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ফিরিয়া
যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন । সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত । গভীর

অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের* জন্তু লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়! রামলাল আসতে পারেন নাই, তাঁর জন্তু কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)। ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না! ওতে আমার দোষ হয়! আমার সঙ্গে কোন জিনিষ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'রবে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা। আপনি আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

অষোদশ

26th OCTOBER, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ।]

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন ক'রতে যাই । সেই মহাপুরুষকে, সেই যালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না ; যিনি আমাদের জন্ম দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্তা পূরণ ক'রতে হবে ! সন্ন্যাসীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন ! অবারিত দ্বার । দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আমাদের জন্ম অপেক্ষা ক'রুছেন । চল, চল, তাঁকে দেখবো !

“অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমুরতি, শ্রবণে যার কথা অঁাখি ঝরে ।”

চল ভাই, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বর প্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা, সহাস্তবদন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক করি !

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । হেমন্তকাল । কার্তিকের শুক্লাসপ্তমী তিথি ।

দু'প্রহর বেলা । ঠাকুরের সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন । সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণ্ডা । বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যান-পথ ; উত্তর দক্ষিণে যাইতেছে । পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই পোস্তা ; তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন । আজ আনন্দের হাট । আনন্দ-ময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল । কি আশ্চর্য্য ! আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখদর্পণে কেন ? বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্র, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর-প্রদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত-গঙ্গাবারিকণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল । কি আশ্চর্য্য ! সত্য সত্যই ‘মধুমং

পার্শ্বঃ রজঃ’—উজ্জানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই! ইচ্ছা হয়, উজ্জানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারি গাঙ্গবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উজ্জানের তরুলতা গুল্মপত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহরহঃ যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্তদৃষ্টে হইয়া তাকাইয়া থাকি! কেন না দেখিতেছি ভুলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুরবাড়ীর পূজারী, দৌবারিক, পরিচারক, কেন সকলকে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ভায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উজ্জানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নিশ্চিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন! যেন একটা মোমের বাগান, গাছপালা, ফল পাতা, সব মোমের; বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগানমধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের! এখানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া!

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল, এঁরা তখন শ্রীরন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান; নারায়ণ, পণ্ট, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, স্বরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগিনের বাড়ী নিকট, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুল্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভার ও সমাধি হইতে থাকে। একটা যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, ছেলেদের কেহ তাঁর কাছে রাজি দিন থাকেন, কেন না, তারা সংসারে বিবাহাদিসম্বন্ধে বা বিষয় কন্ঠে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন; তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত ; The Undifferentiated and the Differentiated.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব রাম দেখছি! তোমরা সব ব'লে আছ; দেখছি রামই সব এক একটা হ'য়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হ'য়েছেন; তবে আপনি যেমন বলেন, 'আপো নারায়ণ,' জলই নারায়ণ; কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি হ'য়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাটুটীতে বসিলেন।

[সত্য কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। ই্যাগা, সত্য কথা কইতে হবে ব'লে কি আমার গুচিবাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ ব'লে ফেলি খাবনা, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে,—আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'লতে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই!

[সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী।]

“আবার সঙ্গে ক'রে কিছু আনবার যো নাই। পান, খাবার,—কোন জিনিস সঙ্গে ক'রে আনবার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হলো কি না। হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই!”

এই সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়, হৃদয়* যত্নমল্লিকের বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে; আপনার সঙ্গে, দেখা ক'রতে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হৃদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। তোমরা বোসো।

এই ব'লে কালো বার্গিস করা চটা জুতাটা প'রে তিনি পূর্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

* ‘হৃদয় মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের অন্যতম একমাত্র পুত্রের নিকট সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ী। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কত পক্ষীমন্দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না।

লাল সুরকীর উজানপথ । সেই পথে ঠাকুর পূর্বদিক হইয়া যাইতেছেন । পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । দক্ষিণে উঠানের কটক রহিল ; সেখানে অশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল । বামে কুঠি । + তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ ;—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজি-তলা ও মা কালীর পুষ্কণীর সোপানাবলি-শোভিত ঘাট । ক্রমে পূর্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসী মঞ্চ । উজানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদুমল্লিকের বাগানের কটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[সেবকসন্নিকটে ।]

হৃদয় কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান । দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ত্রায় নিপতিত হইলেন । ঠাকুর উঠিতে বলিলেন । হৃদয় আবার হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাদিতে লাগিলেন ।

কি আশ্চর্য্য ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাদিতেছেন ! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল ! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই । একি ! যে হৃদয় তাঁকে কত যজ্ঞা দিয়াছিল, তাঁর জন্ম ছুটে এসেছেন ! আর কাদছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখন যে এলি ?

হৃদয় (কাদিতে কাদিতে) । তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্তে এলাম । আমার দুঃখ আর কার কাছে ব'লবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাধুন্যার্থ, সহাস্তে) । সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে । সংসার ক'র্তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে । (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক এক বার তাই আসে ; এসে ঈশ্বরীয় কথা ছুটো শুন্লে মনে শান্তি হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোর কিসের দুঃখ ?

হৃদয় । (কাদিতে কাদিতে) আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুই তো ব'লেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক, আমার ভাব আমাতে থাক !'

হৃদয় । ই! তাতো ব'লেছিলাম—আমি কি জানি ?

+ কুঠি—বৈঠকখানা ; আগে এখানে নীল কুঠি ছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ এখন তবে আয়, আর এক দিন তখন ব'সে কথা কহিব । আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে ।—এবার দেশে ধান টান কেমন হ'য়েছে ?

হৃদয় । হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ তবে আয় আবার এক দিন আসিস্ ।

হৃদয় আবার মাষ্টার হইয়া প্রণাম করিল । ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন । সঙ্গে মাষ্টার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমার সেবাও যত ক'রেছে, যজ্ঞগাও তেমনি দিয়েছে ! আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় ব'লে, “এই দেখ, আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না ।” আবার বলতো, “বোকা—আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেয়িয়ে যেতো !” এক দিন এ রকম ক'রে যজ্ঞগা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহ ত্যাগ ক'রতে গিয়েছিলুম !

মাষ্টার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন । বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এমন লোকের জন্ত ইনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা অত সেবা ক'রত,—তবে কেন ওর এমন হলো ? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম করে আমাকে দেখেছে । আমি তো রাত দিন বেহুঁস হ'য়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোর ভুগেছি । ও যে রকম ক'রে আমায় রাখতো, সেই রকম আমি থাকতুম ।” মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন । হয়ত ভাবিতেছিলেন যে, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই ।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পহুছিলেন । ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । ঠাকুর আবার ছোট খাট্টীতে উপবিষ্ট হইলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে—নানাপ্রসঙ্গে ।

[ভাব, মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব ।]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্ত ছাড়া কয়েকটি কোলগরের ভক্ত আসিয়াছেন ; তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার ক'রেছিলেন ।

কোয়গরের ভক্ত । মহাশয় ! শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয় । কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো ; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অল্প সখী বোলতো, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁ'নি—এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণবিলাস ক'রছেন ।'

“ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না । গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে ;—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে । তাই ভাবে—‘হাসে কাঁদে, নাচে গায় ।’

“অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না । আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে !”

কোয়গরের ভক্ত । শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে ? তাঁর নাম করতে করতে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না । তাঁর ধ্যান ক'রতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক দিন কিছুই হ'লো না ।

[কর্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন ।]

“কর্ম চাই, তবে দর্শন হয় । এক দিন ভাবে হালদার পুকুর * দেখ্লাম । দেখি একজন্ম ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখছে ॥ বেন দেখালে, পানা না ঠেলে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না । ধ্যান জপ এই সব কর্ম, তাঁর নাম-গুণকীর্তনও কর্ম—দান, যজ্ঞ এই সবও কর্ম ।

“মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাৎতে হয় । তার পর নিৰ্জনে রাখতে হয় । তার পর দই ব'সলে পরিশ্রম করে মন্থন ক'রতে হয় । তবে মাখন তোলা হয় ।”

মহিমাচরণ । আজ্ঞা হাঁ, কর্ম চাই বই কি ! অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয় । পড়তেই কত হয় ! অনন্ত শাস্ত্র !

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার),—না আগে ঈশ্বর লাভ ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মহিমার প্রতি) । শাস্ত্র কত প'ড়বে ? শুধু বিচার

* হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ী । সেই বাড়ীর সম্মুখে হালদারপুকুর ; একটী দিঘী বিশেষ ।

ক'রলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কৰ্ম কর । গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন ।

“বই পড়ে কি জানবে ? যত ক্ষণ না হাটে পঁহুঁছান যায় ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ । হাটে পঁহুঁছিলে আর এক রকম । তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুন্তে পাবে । ‘আলু নাও’ ‘পরসা নাও’ স্পষ্ট শুন্তে পাবে !

“সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ করছে । কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাগী উড়ছে, ঢেউ হ'চ্ছে,—দেখতে পাবে ।

“বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না । অনেক তফাৎ । তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়্‌কুটো বোধ হয় ।

“বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার । তাঁর ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্ত অত ব্যস্ত কেন ? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না ;—কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে !

“কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা থাকি খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন । বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দ্বারবান্‌ সব সেলাম ক'রবে ।” (সকলের হাস্য) । *

[কৰ্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ ।]

একজন ভক্ত । এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয় ? (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই কৰ্ম চাই । ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না । যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে । নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর ; ‘দেখা দাও’, ব'লে । ব্যাকুল হ'য়ে কাদো ! কামিনী-কাঞ্চনের জন্ত পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো ; তবে তাঁর জন্ত একটু পাগল হও । লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্ত অমুক পাগল হ'য়ে গেছে । দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো !

“শুধু, ‘তিনি আছেন’ ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে ? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে । পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায় ?

* “Seek ye first the Kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you.”

চারা করো, চারা ফেলো । ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে । তখন আনন্দ হবে । হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো—মাছটা ধপাঙ্ করে উঠলো । যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ ।

“দুধকে দই পেতে মন্থন ক’রলে তবে তো মাখম্ পাবে !

(মহিমাচরণের প্রাতি ।) এ তো ভাল বালাই হ’লো ! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন ! মাখম্ তুলে মুখের কাছে ধরো ! (সকলের হাস্য) ।

“ভাল বালাই—মাছ ধ’রে হাতে দাও !

“একজন রাজাকে দেখতে চায় । রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে । প্রথম দেউড়ী পার না হ’তে হ’তে বলে, ‘রাজা কই?’ যেমন আছে, এক একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে !”

[ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা ।]

মহিমাচরণ । কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয় । তাঁর কৃপার উপর নির্ভর । তবে ব্যাকুল হ’য়ে কিছু কর্ম ক’রে যেতে হয় । ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয় ।

“একটা সুযোগ হওয়া চাই । সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদগুরু লাভ ; হয় তো এক জন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে ; হয় তো দ্বীটী বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক ; কি বিবাহ আদ্যপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হ’তে হ’লো না ;—এই সব যোগাযোগ হ’লে হ’য়ে যায় ।

“এক জনের বাড়ীতে ভারি অসুখ ;—যায় যায় । কেউ ব’লে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি প’ড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাকবে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল্ মারবার সময় ব্যাঙটা ঘাই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে ; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার ক’রে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে । তখন যার বাড়ীতে অসুখ, সেই লোক দিন রাত নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরলো, আর ব্যাকুল হয়ে ঐ সব খুঁজতে লাগলো । মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, ‘ঠাকুর ! তুমি যদি জোটপাট ক’রে দাও, তবেই হয় !’ এইরূপে যেতে যেতে সত্য

সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার খুলি পড়ে র'য়েছে। দেখতে দেখতে এক পসলা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি ব'ল্ছে, 'হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'লো, 'সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে প'ড়েছে; এখন কৃপা করে আর কয়টির যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর!' ব্যাকুল হ'য়ে ভাব'ছে। এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আস'ছে। তখন সে লোকটির ভারি আহ্লাদ হ'ল; আর সে এত ব্যাকুল হ'লো যে বুক ছড়্ ছড়্ ক'রতে লাগলো; আর সে বলতে লাগলো, হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে; অনেকগুলির যোগাযোগও হ'ল! কৃপা ক'রে এখন আর যে গুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও!' বলতে বলতে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো; মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটি আনন্দে হাত তালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

“তাই বলছি, ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম ।]

ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ ; ঠিক সন্ন্যাসী কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় ক'রতে পারে না। সঞ্চয় না করে 'পঙ্খী আউর দরবেশ।' পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব,—হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চ'লে যাবো মংলব হ'ল। ভাবলুম, কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন ক'রে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না। (হাস্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্মও রাখ।

মহিমা । 'এ ও' কি আর থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি, মাটিই টাকা,

টাকাই মাটি' এই বিচার ক'রতে ক'রতে যখন টাকা গদার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষীছাড়া হ'লুম! মা লক্ষ্মী যদি খ'য়াই বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হবে! তখন হাজার মত পাটয়ারি ক'বলুম। ব'ল্লুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকে! এক জন তপস্বী করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তুমি বর লও। সে বলে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর, যেন আমি নাতির সঙ্গে সোণার খালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য, সোণার খাল, সব হ'ল। (সকলের হাস্য)।

“মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বন্ধ, তিনিই মুক্ত হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হ'লেই বন্ধ—নিকৃতির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিকৃতির বাটীতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

“ছেলে ভূমিষ্ট হ'য়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ট হ'য়ে এই বলে কাঁদে—'কাঁহা এ, কাঁহা এ'; এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম।

“তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।”

[সংসার ত্যাগ ।]

অহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি বেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা!

“রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করবার পর ব'ল্লেন, আমি সংসার ত্যাগ ক'রব। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন ব'ল্লেন, 'রাম! আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তার পর সংসার ত্যাগ ক'রো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া। তা যদি হয়, তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্বাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন।

“সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়। যুদ্ধ কেজা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল;—খাওয়া মেলে;—ধর্মপত্নী অমেক রক্ষণ সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য সান্ত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহে, কেজার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।

“আর সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটো পাত হ’য়ে । ঝড়ের এঁটোপাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আস্তাকুড়ে । হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সেই দিকে যায় । কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায় । তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন ; ভাল, এখন সেইস্থানেই থাক—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে ।

। সংসার ও আত্মসমর্পণ (Resignation) ; রামের ইচ্ছা ।]

“সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ । তা হ’লে আর কোন গোল থাকবে না । তখন দেখবে, তিনিই সব ক’রছেন । সবই ‘রামের ইচ্ছা’ ।

একজন ভক্ত । ‘রামের ইচ্ছা’ গল্পটি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কোন এক গ্রামে একটা তাঁতী থাকে । বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে । তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে । খরিদার দাম জিজ্ঞাসা ক’রলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাম ১২ টাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম ১০ আনা, রামের ইচ্ছা মুনফা ৮০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৮০ । লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত । লোকটা ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে ব’সে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে । এক দিন অনেক রাত হ’য়েছে, লোকটার ঘুম হ’চ্ছে না, ব’সে আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে ; এমন সময় সেই পথ দিয়ে এক দল ডাকাত ডাকাতি ক’রতে যাচ্ছে । তাদের একজন মুঠের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে ব’লে, ‘আয় আমাদের সঙ্গে’ ।—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চ’ললো । তার পর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি ক’রলে ! কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায় দিলে । এমন সময়ে পুলিশ এসে পড়ল । ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটা, মাথায় মোট, ধরা প’ড়ল । সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ’ল । তার পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার । কিন্তু গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত । তারা সকলে ব’লে, হজুর ! এ লোক কখনও ডাকাতি ক’রতে পারে না । সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কিগো, তোমার কি হ’য়েছে বল ?’

তাঁতী ব’লে, হজুর ! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম । তার পর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হ’ল ।

আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা ক'রছিলাম আর তাঁর নাম গুণ গান ক'রছিলাম । এমন সময়ে, রামের ইচ্ছা, এক দল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল । রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধ'রে টেনে লয়ে গেল । রামের ইচ্ছা তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতী কলে । রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিল । এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল । রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম ! তখন, রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা হাজতে দিল । আজ সকালে রামের ইচ্ছা, হজুরের কাছে এনেছে ।

“অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন । তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্লেক, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে ।

“সংসার করা, সম্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা । তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর ।

“তা না হ'লে আর কিই বা ক'রবে ?

“একজন কেরাণী জেলে গিছিল । জেল খাটা শেষ হ'লে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল । এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই করে লাচবে । না—কেরাণীগিরিই ক'রবে ?

“সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে । যার জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার এখান সেখান নাই । তার সব সমান । যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে ।

[কেশব সেন, সংসার ও জীবন্মুক্তি ।]

“যখন কেশবসেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, ব'লেছিলাম—‘এরই ল্যাজ খসেছে !’ সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো । কেশব বল্লেন, ‘তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি’ । আমি বল্লাম, যত দিন বেড়াচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না ; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে । তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে । তেমনি মানুষের যত দিন অবিচার ল্যাজ না খসে, তত দিন সংসার জলে পড়ে থাকে । অবিচার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসার থাকতে পারে ।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[গৃহস্থশ্রমকথা প্রসঙ্গে ।]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হ'য়েছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্তা উদয় হ'য়েছে—সব সমস্তা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক হ'য়েছেন। দয়ানন্দ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও যখন তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্বন করে ঘোলটা খান, আর একরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক হ'য়েছেন!—কি আশ্চর্য্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ সব কথা কিরূপে বলছেন! এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা! যেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু, Father (পিতা) Father (পিতা) করে পাগল হ'য়েছিলেন, ইনি মা মা ক'রে পাগল। শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে,—ঈশ্বর প্রেম 'কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহারও জলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক বলে তো এত জোর হয় না; কেন না, তারা ত্যাগী নয়, তাদের জলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি আশ্চর্য্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্ম্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাবছেন, 'ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ ক'রিতে বলেন না—বরং বলছেন, সংসার

কেল্লা স্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার বলছেন, সংসারে থাকবে না ভো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে রেপিয়ে এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ'লো, জীবমুক্ত সংসারেও থাকতে পারে। আদর্শ—কেশব সেন? তাঁকে ব'লেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ থসেছে—আর কা'র হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল ব'লছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে—নচেৎ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের ভুঁড়ী হয়ে গেলে, চারিদিকের বেড়া ভেঙ্গে দাও আর না দাও; এমন কি, হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হবে না। নির্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক'রে, সংসারে এসে থাকলে কিছু ভয় নাই। তাই, নির্জনবাস কথাটা কেবল ব'লছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর দু-একটা সংসারী ভক্তের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের কথার পরই বলিলেন,—

[নিলিপ্ত সংসারী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি)। আবার সেজো বাবুর* সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গি'ছলাম। সেজো বাবুকে ব'ল্লুম, 'আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়।' সেজো বাবু ব'লে 'সেজো বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজো বাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র ব'লে, তোমার একটু বদলেছে—তোমার ভুঁড়ি বদলেছে! সেজো বাবু আমার কথা ব'লে, 'ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল।' আমি লক্ষণ দেখবার জন্ত দেবেন্দ্রকে ব'ল্লুম 'দেখি গা তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিন্দুর ছড়ান? তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

“প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঈর্ষ্যা, বিদ্वा, মান, সন্ত্রম? আমি অভিমান দেখে সেজো-বাবুকে ব'ল্লুম,

* সেজো বাবু—রাণী রাসমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিদ্যাস। পরমহংসদেবকে সার্বজনীন ভক্তি করিতেন ও শিষ্যের জায় সেবা করিতেন।

‘আচ্ছা, অভিমান জানে হয়, না? অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হ’য়েছে, তার কি ‘আমি পণ্ডিত,’ ‘আমি জ্ঞানী,’ ‘আমি ধনী,’ ব’লে অভিমান থাকতে পারে?

“দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ’ল। সেই অবস্থাটা হ’লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক’রে একটা হাসি উঠিল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তখন খড় কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি, যেন শকুনি খুব উচুতে উঠছে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর!

[যোগ ও ভোগ ।]

“দেখলাম, যোগ ভোগ দুইই আছে; অনেক ছেলে পুলে, ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে;—তবেই হ’লো, অত জ্ঞানী হ’য়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। ব’ল্লম, তুমি কলির জনক। জনক ‘এদিক উদিক হুদিক রেখে খেয়েছিল হুধের বাটি।’ তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে, তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

“তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। ব’লে, এই জগৎ যেন একটা ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটা ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান ক’রতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড় লোক! ব্যাখ্যা ক’রতে ব’ললাম;—তা ব’লে, “এ জগৎ কে জানতো?—ঈশ্বর মানুষ ক’রেছেন, তার মহিমা প্রকাশ করবার জন্ত। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।”

[অসভ্যতা ও ব্রাহ্ম-সমাজ ।]

“অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হ’য়ে ব’লে, ‘আপনাকে উৎসবে আসতে হবে।’ আমি ব’ললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা;—আমার তো এই অবস্থা দেখছে!—কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।’ দেবেন্দ্র ব’লে, ‘না, আসতে হবে তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো;—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব’লে, আমার কষ্ট হবে।’ আমি ব’ললাম; তা পারবো না; আমি বাবু হ’তে পারবো না। দেবেন্দ্র, সেজো বাবু, সব হাসতে লাগলো।

“তার পরদিনই সেজো বাবুর কাছে দেবেশ্বের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ ক’রেছে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না! (সকলের হাস্য)।

[নিলিপ্ত গৃহস্থ ও কাপ্তেন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। আর একটা আছে—কাপ্তেন।* সংসারী বটে, কিন্তু ভারি ভক্ত। তুমি আলাপ কোরো।

“কাপ্তেনের বেদ বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কণ্ঠস্থ। তুমি আলাপ ক’রে দেখো।

“খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে ?

“ওর বাড়ীতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন!—বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারি ক’রে খাওয়ায়। আমি এক দিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহুঁস হ’য়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ক’ক ক’রে বসিয়ে দেয়! অত আচারী ঘৃণা ক’রুলে না।

“কাপ্তেনের অনেক খরচা। কালীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। মাগ আগে কুপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হ’য়েছে যে, সব রকম খরচ ক’রতে পারে না।

“কাপ্তেনের পরিবার আমায় ব’ল্লে যে, সংসার ওর ভাল লাগে না। তাই মাঝে ব’লেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে, ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো, ক’রতো।

“ওদের বংশই ভক্ত। ওর বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক’রতো।

“লোকটা ভারি আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে কেশব সেন ব্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে; জাত নাই। আমি ব’ল্লুম,—‘আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুন্তে যাই—আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?’ তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি ব’ল্লুম, একটু বিরক্ত হ’য়ে, আমি তো টাকার জন্ত যাই না—আমি হরিনাম শুন্তে যাই—

* কাপ্তেন—শ্রীবিখনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী, নেপালের রাজার উকিল (Resident) তিনি কলিকাতায় থাকিতেন। অতি সদাচারনিষ্ঠ স্বাক্ষর ও পণ্য ভক্ত।

দক্ষিণেশ্বরে । মনোহন, হৃদয়, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১২৫

আর তুমি লাট সাহেবের বাড়ীতে যাও কেমন করে ? তারা নেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে ? এই সব বলার পর তবে একটু থামে ।

“কিন্তু খুব ভক্তি । যখন পূজা করে, কর্পূরের আর্পিত করে । আর পূজা ক'রতে ক'রতে আসনে বসে স্তব করে । তখন আর একটা মানুষ । যেন তন্ময় হয়ে যায় ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বেদান্তবিচারে ।

[মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) । বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত সব মিথ্যা । যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিনি অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ । এ সব, তোমার ভাবের কথা । স্বপ্নও যত সত্য জাগরণও সেইরূপ সত্য । একটা গল্প বলি শুনো । তোমার ভাবের—

“এক দেশে একটা চাষা থাকে । ভারী জ্ঞানী । চাষ বাস করে—পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেক দিন পরে হ'য়েছে ; নাম—হাক্ক । ছেলেটার উপর বাপ মা দু'জনেরই ভালবাসা ; কেন না, সবে ধন নীলমণি । চাষাটা ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে । এক দিন মাঠে কাজ ক'রছে, এমন সময় এক জন এসে খপর দিলে হাক্কর কলেরা হ'য়েছে । চাষাটা বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটা মারা গেল । বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হ'লো কিন্তু চাষাটার যেন কিছুই হয় নাই । উন্টে আবার সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হবে ? তার পর আবার চাষ বাস ক'রতে গেল । বাড়ী ফিরে এসে আবার দেখে, পরিবার আরো কাঁদছে । পরিবার আবার ব'লে, ‘তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্ত একবার কাঁদলেও না ?’ চাষা তখন স্থির হয়ে ব'লে, ‘কেন কাঁদছি না বলবো ? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি । দেখলাম যে, আমি রাজা হ'য়েছি আর আট ছেলের বাপ হ'য়েছি—আর খুব সুখে আছি । তার পর ঘুম ভেঙে গেল । এখন মহা ভাবনায় প'ড়েছি—আমার সেই আট ছেলের জন্ত শোক ক'রবো, না তোমার এই এক ছেলে হাক্কর জন্ত শোক ক'রবো ?

“চাষা জানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্যবস্তু, সেই আত্মা ।

“আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। আমি ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।”

একজন ভক্ত । ওজনে কেন কম পড়ে ? (সকলের হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্ম—জীবজগৎ বিশিষ্ট । প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয় । অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হ'য়েছেন, এই বোধ হয় ;—তিনিই চতুর্কিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন ।

“বেলের সার ব'লতে গেলে সাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয় । কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল ব'লতে গেলে শুধু সাঁস ওজন ক'রলে হবে না । ওজন করবার সময় সাঁস, বীচি, খোলা, সব নিতে হবে । যারই সাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা । যারই নিত্য, তাঁরই লীলা ।

“তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই । মায়া ব'লে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না । তা হ'লে যে ওজনে কম প'ড়বে ।”

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ ।]

মহিমাচরণ । এ বেশ সামঞ্জস্য ;—নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । জানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ । ভক্তেরা সব অবস্থা লয় । জানী দুধ দেয় ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে । (সকলের হাস্য) । এক একটা গরু আছে—বেছে বেছে খায় ; তাই ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ দেয় । যারা অতো বাছে না আর সব খায়, তারা হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয় । উত্তম ভক্ত—নিত্য, লীলা দুই লয় ; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সন্তোষ ক'রতে পায় । উত্তম ভক্ত* হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয় । (সকলের হাস্য) ।

মহিমাচরণ । তবে দুধে একটু গন্ধ হয় । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয় । একটু আওনে আউটে নিতে হয় । জ্ঞানায়ির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হ'লে আর গরুটা থাকবে না । (সকলের হাস্য) ।

* উত্তম ভক্ত—যে মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র যয়ি পশুতি ।

ভক্তাঃ ন প্রশস্তাঃ সচ মে ন প্রশস্তাঃ ॥

[ঔকার ও নিত্যলীলাযোগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । ঔকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল ‘অকার উকার মকার ।’

মহিমাচরণ । অকার, উকার, মকার—কি না সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ । ট-অ-অ-ম-ম্ । লীলা থেকে নিত্যে লয় ;—স্থূল, স্থন্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয় । জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয় । আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিষ গ’ড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হ’ল । নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ’ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, স্থন্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো । আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ’ল । নিত্য ধ’রে ধ’রে লীলা, আবার লীলা ধ’রে ধ’রে নিত্য । * আমি টং শব্দ উপমা দিই । আমি ঠিক এই সব দেখেছি । আমার দেখিয়ে দিয়েছে, চিৎসমুদ্র অন্ত নাই । তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আবার ঐতেই লয় হ’য়ে গেল । চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় ; তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না ।

মহিমাচরণ । ষাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই । তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, তাঁরা লিখবেন কখন ! লিখতে গেলেই একটু হিসাবী বুদ্ধি দরকার ! তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে ।

[সংসারাসক্তি ও ব্রহ্মানন্দ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না ? তাঁকে লাভ ক’রুলে আসক্তি যায় ।† যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হ’লে ইন্দ্রিয়স্বর্থ ভোগ ক’রতে, বা অর্থ মান সম্বন্ধের জন্ত, আর মন দৌড়ায় না ।

“বাহুল্যে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা হ’লে আর অন্ধকারে যায় না ।

“রাবণকে ব’লেছিল, তুমি সীতার অন্ত মায়ায় নানারূপ ধ’রুছো, একবার রামরূপ ধ’রে সীতার কাছে যাও না কেন । রাবণ ব’লে “তুচ্ছং ব্রহ্মপদং

* নিত্য ধ’রে লীলা &c—From the Absolute to the Relative, from the Infinite to the Finite—from the Undifferentiated to the Differentiated—from the Unconditioned to the Conditioned ; and again from the Relative to the Absolute &c. &c.

† ব্রহ্মবর্জ্যং ব্রহ্মোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ।

পরবধ্বসজঃ কৃতঃ—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্তু তো সামান্য কথা ! তা রামরূপ কি ধ'রবো ।”

[সাধন ও সিদ্ধি ।]

“তাই জগুই সাধন ভজন । তাঁকে চিন্তা যত ক'রবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি ক'মবে । তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম প'ড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর ক'মবে, পরস্তুকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পণ্ডিত্য চ'লে যাবে, দেবতাব আসবে, সংসারে একবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে । তখন সংসারে যদিও থাকো, জীবমুক্ত হ'য়ে বেড়াবে । চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল ।

[জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমায় প্রতি) । যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বৈদ্য বিচার করো, আর ‘স্বপ্নবৎ’ বল, তার ভক্তি যাবার নয় । ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই । একটা মুষল বানা বনে পড়েছিল, তাতেই ‘মুষলং কুলনাশনম্ ।’

“শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয় ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায় । বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয় । জ্ঞান-বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু ক'রে বেড়ে যায় ; যদুবংশ ধ্বংস ক'রেছিল মুষল, তারই মত ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

হাজরা মহাশয় ।*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ববারাণ্ডায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন । বয়স ৪৬।৪৭ হইবে । ঠাকুরের দেশের লোক । অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কাশীরপুকুরের সন্নিকট মড়াগোড় গ্রাম ইহার জন্মভূমি । সম্প্রতি (১৯০৬ সালের চৈত্র মাসে) স্বদেশে থাকিয়া ইহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । যুতাকালে ঠাকুরের প্রতি ইহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । ইহার বয়সক্রম ৬৩, ৬৪ বৎসর হইয়াছিল ।

হইয়াছে,—বাহিষে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়ীতে গিয়া থাকেন । বাড়ীতে কিছু জমি টমি আছে, তাহাতেই স্ত্রী-পুত্রকন্যাদির ভরণপোষণ হয় । তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্ত হাজরা মহাশয় সর্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়, সর্বদা চেষ্টা করেন । কলিকাতায় সর্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠনুঠনেনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করেন ও সাধুর ত্রায় সেবা করেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্বদা হ'য়ে থাকে । হাজরা মহাশয় বড় তর্কিক, প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তরঙ্গে ভেসে এক দিকে চলে যেতেন । বারাণ্ডায় আসন ক'রে সর্বদা জপের মালা লয়ে জপ ক'রুতেন ।

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর অসুখ সংবাদ আসিয়াছে । রামলালকে দেশ থেকে আসবার সময় তিনি হাতে ধ'রে অনেক ক'রে বলেছিলেন 'খুড়ো মহাশয়কে + আমার কাকুতি জানিয়ে বোলো, তিনি যেন প্রতাপকে ব'লে ক'য়ে দেশে পাঠিয়ে দেন ; একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয় ।'

ঠাকুর তাই হাজরাকে ব'লেছিলেন, 'একবার বাড়ীতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো ; তিনি রামলালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন । মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয় ? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো' ।

ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন । মাষ্টারও আছেন ।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্তে) । মহাশয় ! আপনার কাছে দরবার আছে । আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে ব'লেছেন ? ওর আবার সংসারে যেতে ইচ্ছা নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওর মা রামলালের কাছে অনেক ছুঃখ ক'রেছে ; তাই বল্লম, তিন দিনের জন্ত না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো । মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয় ? আমি বৃন্দাবনে র'য়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়লো ; ভাবলুম—মা যে কাঁদবে ; তখন আবার সেখানে বাসুর সঙ্গে এখানে চ'লে এলুম ।

“আর সংসারে যেতে জানীর ভয় কি ?

মহিমাচরণ (সহাস্তে) । মহাশয়, জ্ঞান হ'লে তো !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । হাজরার সবই হ'য়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা র'য়েছে, কিছু টাকা ধার র'য়েছে । মামীর সব অস্থখ সেয়ে গেছে, একটু কষ্ট আছে !—(সকলের হাস্য) ।

মহিমা । কোথায় জ্ঞান হ'য়েছে, মহাশয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । না—গো, তুমি জান না । সকাই বলে, হাজরা একটা লোক, রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে আছে । হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে ? (সকলের হাস্য) ।

হাজরা । আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না ; তা এখানকার নাম কেউ ক'রবে কেন ?

মহিমা । মহাশয় ! ও কি জানে ? আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন, ও তাই করবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর ; ও আমায় ব'লেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা নাই ।

মহিমা । ভারি তর্ক করে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয় (সকলের হাস্য) । তর্ক যখন করে, হয় তো আমি গালাগালি দিয়ে বস্লাম । তর্কের পর মশারির ভিতর গিয়ে হয় তো শুয়েছি ; আবার কি ব'লেছি মনে ক'রে বেরিয়ে এসে, হাজরাকে প্রণাম ক'রে যাই,—তবে হয় !

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন ? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ । যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য ভারি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি । শুদ্ধাত্মা কিরূপ ! যেমন চুঙ্ক-পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুঙ্ক-পাথর চূপ করে আছে—নিষ্ক্রিয় ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[সন্ধ্যা-সঙ্গীত ও ঈশান-সংবাদ ।]

সন্ধ্যা আগতপ্রায় । ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন । মণি একাকী বসিয়া আছেন ও কি চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, “গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বোলবো মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও ।” মণি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন ‘ষে আজ্ঞা ।’

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল । তিনি ঠাকুর-দের প্রণাম করিয়া, বীজ মন্ত্র জপিয়া, নামগান করিতে লাগিলেন । ঘরের বাহিরে অপূর্ব শোভা ! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি । বিমল চন্দ্রকিরণে এক দিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, আর এক দিকে ভাগীরথীবক্ষ স্তম্ভ শিশুর ত্রায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে । জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল । আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জল প্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল ! ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে । ষাদশ শিবমন্দিরে—এক একটি করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি । পুরোহিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন ; বাম হস্তে ঘণ্টা, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চ-প্রদীপ, সঙ্গে পরিচারক—তাঁহার হস্তে কাঁসর । আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে রোসনচৌকির স্তম্ভের নিনাদ শুনা যাইতেছে । সেখানে নহবৎখানা, সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিনী বাজিতেছে । আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব—যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ‘কেহ নিরানন্দ হইও না—ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই ; থাকে থাকুক—অগম্য আছেন—আমাদের মা আছেন !—আনন্দ কর । দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না, বাড়ী নাই, ঘর নাই—তবু বুকে জোর আছে তার যে মা আছে । মার কোলে নির্ভর । পাতানো মা নয়, সত্যকার মা । আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন । কে অত ভাবে ! আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গড়েছেন । আমি জানতেও চাই না । যদি

জানাবাব দরকার হয়, তিনি জানিয়ে দেবেন। অত কে ভাবে! মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর!’

বাহিরে কৌমুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে;—কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমামানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারি বিশ্বাস। বলেন যে—একবার যিনি দুর্গা নাম ক’রে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। আর বিপদে ভয় কি? শিব নিজে রক্ষা করেন।

[বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তোমার খুব বিশ্বাস—আমাদের কিন্তু অতো নাই। (সকলের হাস্য) বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ঈশান। আজ্ঞা, হাঁ।

[কর্মযোগ ও ঈশান ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জপ, আত্মিক, উপবাস, পুরস্চরণ এই সব কর্ম ক’রছ। তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম করিয়ে লেন।

“ফলকামনা না ক’রে এই সব কর্ম ক’রে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি ; কর্মত্যাগ কখন ?]

“শাস্ত্রে অনেক কর্ম ক’রতে ব’লে গেছে—তাই ক’রছি; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সেটা অহুঁরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, তা হ’লে আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

[সেবকহৃদয়ে] ।

সন্ধ্যার পূর্বে যনি বেড়াইতেছেন ও ডারিতেছেন—

“কর্মের ইচ্ছা”—এটা তো বেশ কথা! এতে তো Predestination আর Free Will, Liberty আর Necessity, এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্ছে। আমরা

ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়'; আবার আমি তামাক খাচ্ছি 'রামের ইচ্ছায়'; আমি ডাকাতি ক'রছি 'রামের ইচ্ছায়'; আমায় পুলিশে ধরলে 'রামের ইচ্ছায়'; আমি সাধু হ'য়েছি 'রামের ইচ্ছায়'; আমি প্রার্থনা ক'রছি 'হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না'—এ ও 'রামের ইচ্ছা'। সং ইচ্ছা, অসং ইচ্ছা, তিনিই দিচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে, অসং ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন—ডাকাতি করবার ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন? তার উত্তর ঠাকুর বলেন এই—তিনি আনোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ ক'রেছেন, গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছও ক'রেছেন সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর ডাকাতও ক'রেছেন। কেন ক'রেছেন, তা কে ব'লবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?

“কিন্তু তিনি যদি সব ক'রেছেন, তা হ'লে Sense of responsibility ভোঁ যায়! তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর না দর্শন হ'লে, 'রামের ইচ্ছা' ইটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না ক'রলে এটা এক একবার বোধ হয়; আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, Sense of responsibility বোধ, থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন 'রামের ইচ্ছা'। তোতা পাখীর মত 'রামের ইচ্ছা' মুখে ব'লে হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ পুণ্য বোধ রেখে দেন, সুখ দুঃখ বোধ রেখে দেন, শুচি অশুচি বোধ রেখে দেন, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsibility ইত্যাদি রেখে দেন। তা না হ'লে তাঁর মায়ায় সংসার কেমন ক'রে চলবে?

“ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখতে ছুটেছেন—অমনি কেশব আপনার লোক হ'লেন! তখন কাপ্তেনের কথা আর শুনেন না। তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এ সব কথা ভেসে গেল! “কুলটা খাই, কাঁটার আমার কি কাজ?” ভক্তিসূত্র সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়; চার বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ঈশ্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! তুমি সনাতন ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্তিমান করিলে! তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ! সকল ধর্মাবলম্বীদের

তুমি পরমাত্মীয়নির্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল জাখো—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়। হিন্দুর যদি ভক্তি জাখো, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

“ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব’লছেন না। বলেন, “তা হ’লে ওজনে কম পড়ে।” মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক ব’লছেন না, মনের ভুল ব’লছেন না। ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য! জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি ধোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।

“শুনিলাম এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে, আনন্দসিদ্ধনীয়ে অনন্ত-লীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই! মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধিই বা কতটুকু! শুনিলাম, মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ’য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন ক’রেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার ক’রেছেন। অবশ্য ক’রেছেন, কেন না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন! তবে এ চক্ষু চক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্য চক্ষু যাহাকে বলে, তাহার দ্বারা। যে চক্ষু পাইয়া অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক’রেছিলেন; যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক’রেছিলেন; যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন! সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক’রে? সংসার কি ত্যাগ ক’রতে হবে? কৈ, তাও তো আজ ব’লেন না!”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্দশ খণ্ড ।

শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামের গৃহে আগমন ও তাঁহার
সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরীশ ঘোষ, বলরাম,
চুণিলাল, লাটু, মাফটার, নারায়ণ প্রভৃতি
ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ ।

11th March, 1885.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তগৃহে—ভক্তসঙ্গে ।]

ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, 'পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র । ২৯শে ফাল্গুন বুধবার,
ইংরাজী ১১ মার্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ।

আজ আন্দাজ বেলা ১০টার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে
আসিয়া ভক্তগৃহে বসু বলরামের মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন ।
সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত ।

ধন্য বলরাম ! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে !
কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাধিলেন, ভক্তসঙ্গে
কত নাচিলেন, গাইলেন ! যেন গৌরাজ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বস্যাছেন !

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন ; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন
ব'লে ব্যাকুল ! রাত্রে ঘুম নাই ! মাকে বলেন, 'মা ওর বড় ভক্তি, ওকে
টেনে নাও ; মা ওকে এখানে এনে দাও ; যদি সে না আসতে পারে, তা হ'লে
মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি ।' তাই বলরামের বাড়ী
ছুটে ছুটে আসেন । লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের ৬জগন্নাথের
সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন । যখন আসেন অমনি বলরামকে নিমন্ত্রণ করিতে
পাঠান । বলেন, 'যাও—নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে

এসো; পূর্ণ, ছোট নরেন, নারায়ণ এই সব ভক্তকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে। বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এই খানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' হইয়াছে।

['পশ্চাতি তব পস্থানম্' ।]

মাষ্টার নিকটে একটি বিড়ালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহাৰান্তে বৈঠকখানায় সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মসলা বা কাবাব চিনি খাচ্ছেন। অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্নেহে)। তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আসছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

একজন ভক্ত। না মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাত)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। হায়! কে যেন টেনে আনুলে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, 'আমার গাম্ছাটা নিংড়ে দাও তো পা; আর জামাটা শুকোতে দাও; আর আমার পা টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলায়ে দিতে পার?' মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামুখে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা; ঠিক সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধ'রে হ'চ্ছে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই! একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম;—তা, হাতে শিঙ্গীমাছের কাঁটা কোটা মত হ'লো। হাত বন্ বন্ কন্ কন্ ক'বুতে লাগলো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে ক'বুলুম, গাম্ছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুলতে পারি কি না, যাই হাত দিয়েছি.

অমনি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ ; খুব বেদনা ! শেষে মাকে প্রার্থনা ক'রলুম,
“মা, আর অমন কন্ ক'রবো না, মা এবার মাপ কর !”

[ছোট নরেন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ই্যাগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে,
বাড়ীতে কিছু বলবে ? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই ।

মাষ্টার । আর খোলটা বড় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, আবার বলে'য়ে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্লে আমার
মনে থাকে । বলে—ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে ।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল । এমন সময়
উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলি যা উঠিলেন, ‘মাষ্টার মহাশয় ! আপনি
স্কুলে যাবেন না ?’

শ্রীরামকৃষ্ণ । ক'টা বেজেছে ?

একজন ভক্ত । একটা বাজতে দশ মিনিট ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । তুমি এস, তোমার দেবী হ'চ্ছে । একে
কাজ ফেলে এসেছো । (লাটুর প্রতি) রাখাল কোথায় ?

লাটু । চ'লে গেছে ;—বাড়ী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার সঙ্গে না দেখা ক'রে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[অপরাহ্নে—ভক্তসঙ্গে ।]

স্কুলের ছুটির পর মাষ্টার আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর, বলরামের
বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন । ঠাকুরের মুখে মধুর
হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে । মাষ্টারকে ফিরিয়া
আসিতে দেখিয়া, ও তিনি প্রণাম করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে
আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, স্বরেশ মিত্র, বলরাম,
লাটু, চুণিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার
ক'রে দেখো, সে কি বলে ।

[অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

গিরীশ (সহাস্ত্রে) । নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত । যা কিছু আমরা দেখি, শুনি—এ জিনিসটা, কি এই ব্যক্তিটা,—সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই ! Infinity (অনন্ত আকাশ) এক, তার আবার অংশ কি ? অংশ হয় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন,—তিনি ইচ্ছা ক'রলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে ।

“তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না । অনুভব হওয়া চাই । প্রত্যক্ষ হওয়া চাই । উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায় । গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হ'লো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো । কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হ'চ্ছে দুধ । সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে । সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্ত ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হ'ন ।

গিরীশ । নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায় । তিনি অনন্ত !—

[PERCEPTION OF THE INFINITE. *]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'রতে পারে ? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না । আর সব ধারণা করা কি দরকার ? তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পারলেই হ'লো । তাঁর অবতারণাকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো ।

“যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গাদর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম । সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না । (সকলের হাস্য) ।

“তোমার পাটা যদি ছুঁই, তা হ'লে তোমায় ছোঁয়াই হ'লো (সকলের হাস্য) ।

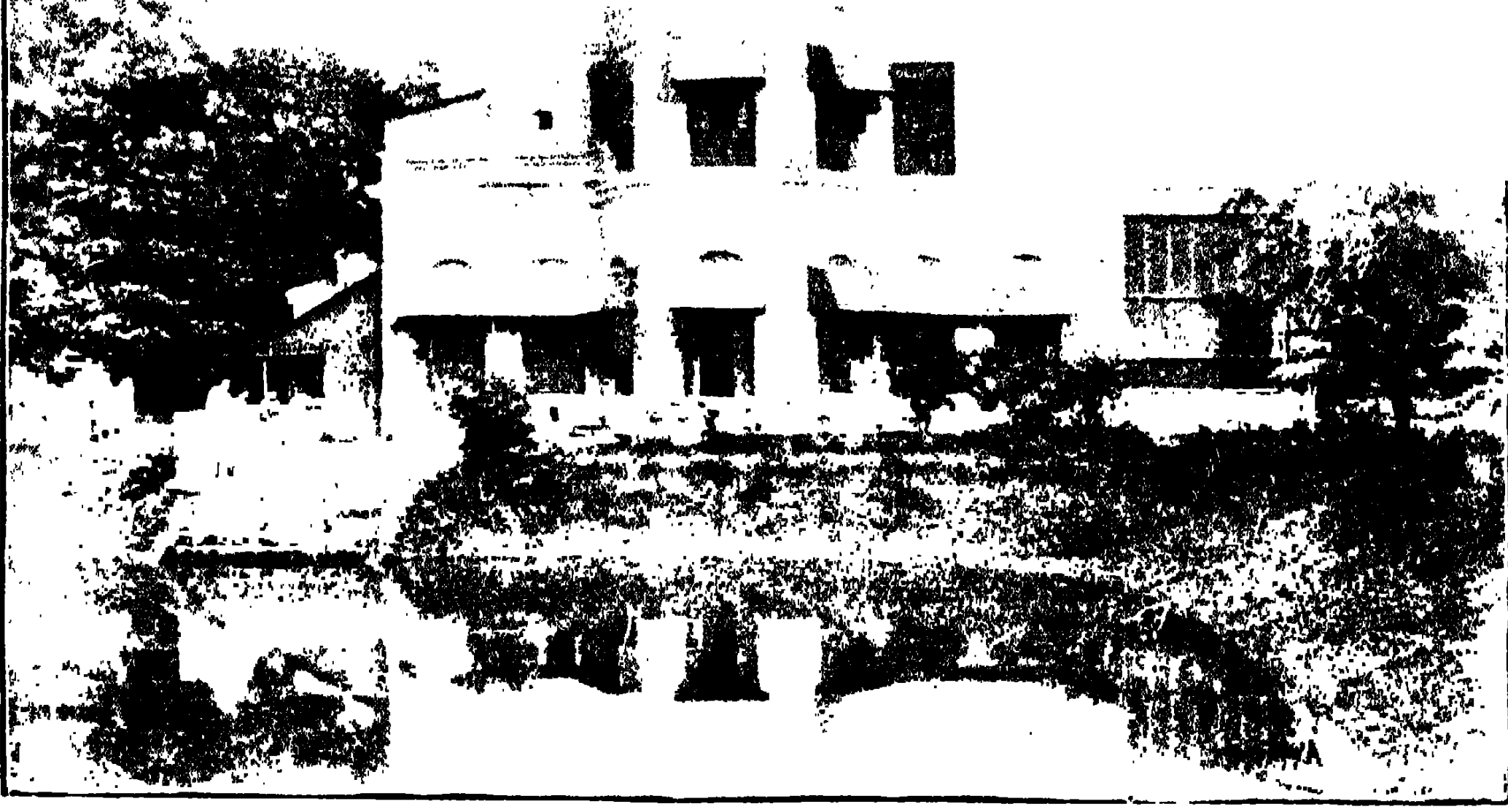
“যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তা হ'লে সাগর স্পর্শ করাই হ'লো ।

“অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী ।—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে) । যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার !

* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures:

কাশীপুর বাগান



১. উপরের অষ্ট গোলকাকার হলঘরে ঠাকুর থাকিতেন। ২. নীচের তলার মাঝখানের পথটি প্রবেশ দ্বার। এই দ্বার দিয়া নীচের হলঘরে যাওয়া যায়—ভক্তেরা বসিল। ৩. নীচের হলঘরের উত্তর পূর্ব কোণে শিশুদিয়ার ঘর, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মেবক ভক্তদিগের থাকিবার ঘর। ৪. উদ্যানবাটিকার পূর্বে ও পশ্চিমে দাঁবাঘাট বিশিষ্ট দুইটা পুকুরিণী। বাটিকার উত্তরে পথ—তাহার উত্তরে রান্নাঘর। ৫. বাটিকার পশ্চিমদিক দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ;—এই পথেরই দক্ষিণ প্রান্তে ১৮৮৬, ১লা জানুয়ারী দিবসে সমাপিত হইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তদের কৃপা করেন।

বলরামের বাটী।



দোতলার বারান্ডার নীচে ঠিক মাঝখানে বাটীর প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের সম্মুখে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এই দ্বারের ঠিক উপরে বাটীর পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বৈঠকখানা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিতেন। এই ঘরের পশ্চিমে ছোট ঘর—এখানেও ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও রাত্রে থাকিলে কখন কখনও শয়ন করিতেন। এই দুই ঘরের আবার উত্তরে

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । অগ্নি তত্ত্ব কাঠে বেশী । ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে । মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন । যে মানুষে দেখবে উজ্জ্বিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জগ্ন পাগল—তঁার প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন ।

(মাষ্টার দৃষ্টে) তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ । অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে । শক্তিরই অবতার ।

গিরীশ । নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঞ্ছনসোগোচরম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর । এ বুদ্ধির গোচর নয়,—কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর । কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি । তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক । শুদ্ধ মনের গোচর । ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই ? তাঁরা চৈতন্তের দ্বারা চৈতন্তের সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন !

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে) । নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; আমায় ব'লেছে, 'গিরীশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস ; এখন আমি আর কি ব'লবো ! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'লতে নাই ।'

* * * * *

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে) । মহাশয় ! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কচ্ছি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে ব'সে আছে ! কি ভাবে ? মহাশয় ! কি বলুন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) ।

“মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী,

পানা পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী ।” (সকলের হাস্য) ।

(সহাস্তে) । কিন্তু ইনি তা নন,—ইনি 'গম্ভীরাত্মা' । (সকলের হাস্য) ।

গিরীশ । মহাশয় ! শোলোকটি কি ব'ল্লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই ক'টা লোকের কাছে সাবধান হবে ;—প্রথম মুখহলসা, হল হল করে কথা কয় ; তার পর ভেতরবুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না ; তার পর কানতুলসে, কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্ত ; দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয় ; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয় । (হাস্য) ।

চুনিলাল । এঁর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে । ছোট নরেন ঠাঁর পোড়ো, বাবুরাম ঠাঁর পোড়া ; নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র—এরা সব ঠাঁর পোড়ো । কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়া শুনা সব খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে ! এঁর নামে দোষ দিচ্ছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাদের কথা কে বিশ্বাস ক'রবে ?

এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারা'ণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল । নারা'ণ গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁতাকে বড় ভালবাসেন !, তাকে দেখবার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল । তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে কাঁদেন । নারা'ণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন ।

গিরীশ (নারায়ণ দৃষ্টে) । কে খবর দিলে ? মাষ্টারই দেখছি সব সারলে ! (সকলের হাস্ত) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । রোসো ! চূপ চাপ ক'রে থাকো ! এঁর (মাষ্টারের) নামে একে বদনাম উঠেছে ।

[অন্তর্চিন্তা ।]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল :

একজন ভক্ত । এখন তত আসেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । 'অন্তর্চিন্তা চমৎকারা,

কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা ।' (সকলের হাস্ত) ।

বলরাম । শিবুগুহোর বাড়ীর ছেলে অন্তর্চিন্তাগুহোর কাছে খুব আনাগোনা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্তর্চিন্তা, এরা সব যায় । সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে ।

একজন ভক্ত । তাঁর (আফিসওয়ালার) নাম তারাপদ ।

[প্রতিগ্রহ ও মতামত ।]

বলরাম (হাসিতে হাসিতে) । বামুনরা বলে, অন্তর্চিন্তা গুহ লোকটার বড় অহংকার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বামুনদের ও সব কথা শুনো না । স্ত্রীদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল । (হাস্ত) । অন্তর্চিন্তাকে আমি জানি, ভাল লোক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তদম্পে—ভজনানন্দে ।]

এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক । সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন । কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন ।

তারাপদ গান গাহিলেন ;—

গীত ।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী ।
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী ॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার ।)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন—
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী ॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) । আহা বেশ গানটী ! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ ?

একজন ভক্ত । হাঁ, উনিই চৈতন্তলীলার সব গান বেঁধেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । এ গানটী খুব উতরেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়কের প্রতি) । নিতাইয়ের গান গাইতে পারো ?

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন ;—

গীত ।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায় ।
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায় ॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলাস সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি ;

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায় ।

রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় আয় ॥

শ্রীগৌরাজের গান হইল,—

গীত ।

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ ।

প্রেম সাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুলমান

(মন মজ্জালে গৌর হে)

ব্রজমাঝে রাখাল সাজে, চরালে গোধন,

ধ'রুলে করে মোহন কাঁশী, মজ্জলো গোপীর মন ;

ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,

মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়,

ভেসে গেল চাঁদবদান !

(মন মজ্জালে গৌর হে)।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটা গান গাও ।

মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস্ ফিস্ ক'রে মাপ চাহিতে লাগিলেন ।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্তে)। মহাশয় ! মাষ্টার কোন মতে গান গাইছে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। ও স্থলে দাঁত বার করবে ; গান গাইতেই যত লজ্জা !

মাষ্টার মুখটা চুণ ক'রে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন ।

শ্রীযুত স্বরেশ মিত্র একটু দূরে ব'সেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে স্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুত গিরীশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্তবদনে কথা কহিতে লাগিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি তো কি ? ইনি (গিরীশ) তোমার চেয়ে ।

স্বরেশ (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা । (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি)। আচ্ছা, মহাশয় ! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান্ !

শ্রীরামকৃষ্ণ । মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র টান্স দেখেছে শুনেছে ;—থুব আধার ! (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ ।

গিরীশ । কি ? বিছা ? ও আমি অনেক দেখেছি ! ওতে আর ভুলি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । আমার একমুহুর ভাব কি জান ?

“বই, শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে
পঁছছিবার পথ ব’লে দেখে । পথ, উপায়, জেনে লবার পর,
আর বই শাস্ত্রে কি দরকার ? তখন নিজে কাজ ক’রতে হয় ।

“এক জন এক খান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তত্ব ক’রতে হবে ; কি
কি জিনিষ লেখা ছিল । জিনিষ কিন্তে দেবার সময়, চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছিল না । কর্তাটা তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ ক’রলেন ।
অনেকক্ষণ ধ’রে অনেক জন মিলে খুঁজলে । শেষে চিঠিখানি পাওয়া গেল ।
তখন আর আনন্দের সীমা নাই । কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে
নিলেন ; আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে । লেখা এই, পাঁচসের
সন্দেশ পাঠাইবে, আর একখান কাপড় পাঠাইবে ; আরও কত কি । তখন
আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অস্তিত্ব
জিনিষের চেষ্টায় বেরলেন । চিঠির দরকার কতক্ষণ ? যতক্ষণ সন্দেশ
কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায় । তার পরই পাবার চেষ্টা ।

“শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে । কিন্তু সব খবর জেনে ক’র
আরম্ভ ক’রতে হয় । তবেতো বস্তুলাভ !

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা
থাকতে পারে ; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চে মনে
মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া ।

“পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে
না ! এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না । (সকলের হাস্য) ।

গিরীশ (সহাস্যে) । মহাশয় ! পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না ?
(সকলের হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর
কোথায় ? কামিনী আর কাঞ্চে, দেহের স্বে আর টাকায় ।

“শকুনি খুব উচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে ! (সকলের হাস্য) ।

“কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া !

[নরেন্দ্রের কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । নরেন্দ্র খুব ভাল ; পাইছে, বাজাতে,

পড়ায় শুনায়, বিচার ;—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী ।
অনেক গুণ ।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন রে ? কেমন গা, খুব ভাল নয় ?

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল ।

[গিরীশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (জমান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি) । দেখ, ওর (গিরীশের) খুব
অমুরাগ আর বিশ্বাস ।

মাষ্টার অবাক হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন । গিরীশ
ঠাকুরের কাছে কয়েক দিন আসিতেছেন মাত্র । মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন
পূর্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একমুত্রে গাঁথা
মণিগণের একটি মণি !

নারায়ণ বলিলেন, মহাশয় ! আপনার গান হবে না ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুরকণ্ঠে মাযের নামগুণগান করিতে লাগিলেন—
গীত ।

যতনে হৃদয়ে রেখে আদরিণী শ্যামা মাকে ।

মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি,

আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,

রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে ॥ (মাঝে মাঝে)

কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো,

জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখে, সে যেন সাবধানে থাকে ॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে
অভিমান করিয়া গাইতে লাগিলেন— গীত ।

গো! আনন্দ হ'লী হ'লী আ! আমার নিরানন্দ

কোরে না ।

(ওমা) ও দুটা চরণ, বিনে আমার মন,

অন্য কিছু আর জানে না ।

তপনতনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বলনা ।

ভয়ানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,

অকুল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না ।

আমি অহিনিশি, দুর্গানায়ে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না,
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবে না ।
আর নিত্যানন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দের কথা গাইলেন—

গীত ।

শিল সন্তে সদা রন্তে আনন্দে মগনা,

সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা) ।

বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,

উভয়ে পাগলের পাঁরা লজ্জা ভয় আর মানে না (মা) ।

ভক্তেরা নিশ্চক্ৰ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন । তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের
অদ্ভুত আশ্চর্য্য মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন ।

গান সমাপ্ত হইল । কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘আমার
আজ গান ভাল হ’ল না—সর্দি হয়েছে ।’

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

(সন্ধ্যাসমাগমে ।)

ক্রমে সন্ধ্যা হইল । সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড়
অরণ্যমধ্যে, অম্বরম্পর্শী পর্বতশিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্দিগন্ত-
ব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল । এই সূর্য্য চরাচর
বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন ? বালক ভাবিতেছে,
আবার ভাবিতেছেন—বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ । সন্ধ্যা হইল ! কি আশ্চর্য্য !
কে এরূপ করিল ? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে ।
মানুষের মতো ঘাঁহাদের চৈতন্ত হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি, কার-
ণের কারণ, পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন ।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল । ভক্তেরা, যে যে আসনে বসিয়াছিলেন,
তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাগ করিতে-
ছেন, তাই সকলে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন । এমন মিষ্ট নাম
তাঁরা কখন শুনে নাই—যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে । এমন প্রেমমাখা বালকের
মা মা ব’লে ডাকা, তাঁরা কখন শুনে নাই, দেখেন নাই ! আকাশ, পর্বত,

মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখবার প্রয়োজন কি ? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন ? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি ? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল ? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল ? কেন ভক্তদের দেখিতেছি, শান্ত ও আনন্দময় ? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি ক্ষুদ্ররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর ? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে ? অবতার ইউন আর নাই ইউন, ইঁহার চরণপ্রাপ্তে মন বিকাইয়াছে আর যাইবার যো নাই ! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা । দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন । নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন । যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় । বলিলেন, “মা, আমি তোমার শরণাগত, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম । দেহসুখ চাই না মা ! লোকমান্য চাই না ; (অনি-মাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না ; কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী, ভক্তি হয় । আর যেন, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী কাম্যনের, উপর ভালবাসা যেন কখন না হয় ! মা ! তোমা বই আমার আর কেউ নাই । আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও ।”

যদি ভাবিতেছেন,—“ত্রিসঙ্ক্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার আয় নিরবচ্ছিন্না, তাঁর আবার সঙ্ক্যা কি ?” যদি পরে বুঝিলেন, লোকশিক্ষার জন্ত ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন—

“হরি আপনি এসে, যোগিবেশে, করিলে নাম সঙ্কীৰ্তন ।”

* * * *

গিরীশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই রাত্রেই যেতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রাত হবে না ?

গিরীশ । না, যখন ইচ্ছা । আপনি যাবেন, আমায় আজ থিয়েটারে (Theatre) যেতে হবে—তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[রাজপথে ।]

গিরীশের নিমন্ত্রণ । রাত্রেই যেতে হবে । এখন রাত ৯টা হবে । বলরামও ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রে খাবার প্রস্তুত ক'রেছেন । পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন,—“বলরাম ! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও ।”

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর ! যেন মাতাল । সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার । পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেকে । একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে ? ঠাকুর বলিলেন, একজন হ'লেই হলো ।

নামিতে নামিতেই বিভোর ! নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান । ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সম্মুখে বলিলেন, হাত ধ'রুলে লোকে মাতাল মনে ক'রবে, আমি আমনি চ'লে যাব ।

বোসপাড়ার তেমাথা পার হইছেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী । এত শীঘ্র চ'লছেন কেন ? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাকছে । না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে ! বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন ? এই মাত্র বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন ; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ-আত্মার গোচর । তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'রছেন । এই কি দেখছেন—“যো কুচ হ্যায়, সো তু'হি হ্যায়” ?

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন । নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল ! কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিতেছেন না ! লোকে বলে, এর নাম ভাব ; এইরূপ কি শ্রীগৌরাক্ষের হইত ?

কে এ ভাব বুঝবে ?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন।

নরেন্দ্রকে ব'লছেন, “ভাল আছ, বাবা ? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।”—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাথা ! তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা ;—এই একটা (দেহী ?) ও একটা (জগৎ ?) ।

জীব-জগৎ ! ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন ! তিনিই জানেন ! অবাক হইয়া কি দেখেছিলেন ! দু একটা কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি ; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোখিত অনাহত শব্দের একটা দুটা শ্রবণ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ভক্ত-গন্ধিরে ।]

দ্বারদেশে গিরীশ ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের স্তায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন ; ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া ছু-তলায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

[সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রাখিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা ; বিষয়কথা, পরচর্চা, পরনিষ্ঠা ; তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা ঘাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর, আসন গ্রহণ করিলেন।

[নিত্যগোপাল ।]

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি) । ওখানে ?—

নিত্য । আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই । শরীর খারাপ । ব্যথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেমন আছিস্ ?

নিত্য । ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুই একগাম নীচে থাকিস্ !

নিত্য । লোক ভাল লাগে না । কত কি বলে—ভয় হয় । এক একবার খুব সাহস হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হবে বৈ কি । তোর সঙ্গে কে থাকে ?

নিত্য । তারক ।* ও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গ্যাঁটা ব'লতো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল । সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো ; গণেশগজ্জী—সঙ্গী বেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হ'য়ে গিচ্ছলো ।

বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল । আবার কি ভাবে অবাক হ'য়ে রহিলেন । কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন, “তুই এসেছিস্ ? আমিও এসেছি ।” এ কথা কে বুঝিবে ? এই কি দেব-ভাষা ?

সপ্তা পরিচ্ছেদ ।

[পার্শ্বদ সঙ্গে । অবতার সম্বন্ধে বিচার ।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত ;—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন । নরেন্দ্র, গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার—অনেকে আছেন ।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন । এদিকে গিরীশের জলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্যলোকে আসেন । ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখবো ।

* শ্রীতারকনাথ ঘোষাল—শ্রীশিবানন্দ ।

বিচার আরম্ভ হইল । ইংরাজিতে হইল না—বাদ্যলাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা । নরেন্দ্র, বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত । তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি ? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্নেহে) । ওরও যা মত আমারও তাই মত । তিনি সর্বত্র আছেন । তবে একটা কথা—আছে—শক্তিবিশেষ । কোনো খানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনো খানে বিদ্যাশক্তির । কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম । তাই সব মানুষ সমান নয় ।

রাম । এ সব মিছে তর্কে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) । না, না, ওর একটা মানে আছে ।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি) । তুমি কেমন ক'রে জান্লে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না ?

নরেন্দ্র । তিনি অবাত্মনসোগোচরম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর । শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন ।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি) । মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে ? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন । না হ'লে কে শিক্ষা দিবে ?

নরেন্দ্র । কেন ? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্নেহে) । হাঁ হাঁ ; অন্তর্ধামীরূপে তিনি বুঝাবেন ।

তার পর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো । Infinity—তার কি অংশ হয় ? Hamilton কি বলেন ? Herbert Spencer কি বলেন ? Tyndal, Huxley, বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । দেখ ইণ্ডগো* আমার ভাল লাগছে না । আমি তাই সব দেখছি ! বিচার আর কি ক'রবো ? দেখছি—তিনিই সব ।

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনিই সব হয়েছেন । তাও বটে, আবার তাও বটে । এক অবস্থায়, অথও মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায় ! নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অথও লীন হয় । তার কি ক'লে বল দেখি ?

* তাঁহার ব্যবহৃত স্মিটকথা—‘ইণ্ডগো’ অর্থাৎ এই গুলি ।

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে) । এটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না !
(সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আবার দু'থাক না নাম্লে কথা কইতে পারি না ।

“বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে ; আবার রামানুজের বিশিষ্ট-
দ্বৈতবাদও আছে ।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । বিশিষ্টদ্বৈতবাদ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । বিশিষ্টদ্বৈতবাদ আছে,—রামানুজের
মত । কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । সব জড়িয়ে একটী ।

“যেমন একটী বেল । এক জন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস
আলাদা ক'রেছিল । বেলটী কত ওজনে জান্বার দরকার হ'য়েছিল । এখন
শুধু শাঁস ওজন ক'রলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায় ? খোলা, বীচি শাঁস
সব এক সঙ্গে ওজন ক'রতে হবে । প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই
সার পদার্থ ব'লে বোধ হয় । তারপর বিচার ক'রে দেখে,—যে বস্তুর শাঁস
সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি । আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয় ; জীব
নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার ক'রতে হয় ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু !
তার পর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি ; যা থেকে ব্রহ্ম ব'লছো
তাই থেকে জীব জগৎ । যারই নিত্য (Absolute) তারই লীলা (Rela-
tive) । তাই রামানুজ ব'লতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । এরই নাম বিশিষ্ট-
দ্বৈতবাদ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[ঈশ্বর দর্শন—God-vision.]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মাষ্টারের প্রতি) আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি
বিচার করবো ? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হ'য়েছেন । তিনিই জীব
ও জগৎ হ'য়েছেন ।

“তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না । বিচার কতক্ষণ ।
যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায় ; শুধু মুখে বলে হবে না, এই আমি দেখছি
তিনি সব হ'য়েছেন । তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই ! চৈতন্য লাভ করলে

সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনীকাকনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয় ।

“চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায় ।”

[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ । Revelation]

বিচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন—

“দেখোঁছ, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায় । আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক । তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তার মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ'লে আর বিচার ক'রতে হয় না, কারকে বুঝিয়ে দিতে হয় না । কি রকম জান ? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ ক'রে আলো হয় । সেই রকম দপ্ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তা হ'লে সব সন্দেহ মিটে যায় । এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায় ?”

[কালী* ও ব্রহ্ম† ।]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন ।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । কৈ কালীধ্যান তিন চার দিন ক'রলুম, কিছুইতো হ'লো না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ক্রমে হবে । কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী । কালী আত্মশক্তি । যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই । যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি ব'লে কই, কালী বলে কই । যাকে তুমি ব্রহ্ম ব'ল্‌চো, তাঁকেই কালী ব'ল্‌ছি ।

“ব্রহ্ম আর কালী অভেদ । যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি । অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয় । কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয় ।

“ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ । ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি ।”

এদিকে রাত হ'য়ে গেছে । গিরীশের থিয়েটারে যেতে হবে । তাই হরিপদকে বলিতেছেন, ‘ভাই, একখানা গাড়ী যদি ডেকে দিস্—থিয়েটার যেতে হবে ।

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The Unconditioned, the Absolute.

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । দেখিস্ যেন আনিস্ ! (সকলের হাস্য) ।

হরিপদ (হাসিতে হাসিতে) । আমি আনতে বাচ্ছি—আর আনবে না ?

[ঈশ্বরলাভ ও কাম । রাম ও কাম ।

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে কখন যেতে হবে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রাখতে হবে ; ‘জনক রাহু ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী !’ (সকলের হাস্য) ।

গিরীশ । থিয়েটারগুলো ছোড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না না ও বেশ আছে ; অনেকের উপকার হচ্ছে ।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে) । এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে ! আবার থিয়েটার টানে !

নবম পরিচ্ছেদ ।

[সমাধি মন্দিরে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিহিতে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন । নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায় ? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল । গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, ‘মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোঁর মানে আছি (রাই) !’

[বিচার ও ঈশ্বর লাভ ।]

(নরেন্দ্রের প্রতি) । “যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই । তোমরা বিচার ক’রছিলে, আমার ভাল লাগে নাই ।

“নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায় ?—যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে । যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ ক’মে যায় । (সকলের হাস্য) অন্ত খাবার প’ড়লে আরো ক’মতে থাকে । দই পাতে পাতে প’ড়লে কেবল সুপ্ সাপ্ । ক্রমে ক্রমে খাওয়া হ’য়ে গেলেই নিদ্রা ।

“ঈশ্বকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে । তাঁকে লাভ হ’লে, আর শব্দ—বিচার—থাকে না । তখন নিদ্রা—সমাধি !”

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে-
ছেন, ও বলিতেছেন, ‘হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ’ ।

কেন একরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের
মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন ? এরই নাম কি মাহুষে ঈশ্বরদর্শন ? কি
আশ্চর্য্য ? দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে । ঐ দেখ, বহির্জগতের
হুঁস চলিয়া যাইতেছে । এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহুদশা—যাহা শ্রীগৌরান্দের
হইয়াছিল । এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন চল করিয়া নারায়ণের
পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন । অ্যাতো গা টেপা, পা
টেপা কেন ? এ কি নারায়ণের সেবা ক’রছেন, না শক্তি সঞ্চার ক’রছেন ?
দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইতেছে । এই আবার নরেন্দ্রের কাছে
হাতজোড় ক’রে কি ব’লছেন ।

ব’লেছেন,—“একটা গান (গা) —তা’হলে ভাল হ’বে ;—উঠতে
পারবো কেমন ক’রে !—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই
আমার)—”

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক ; চিত্রপুত্তলিকার মত চূপ ক’রে রহিয়াছেন ।
আবার ভাবে মাতোয়ারা হ’য়ে ব’লছেন—

“দেখিস্ রাই—যমুনায় যে প’ড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী !”

আবার ভাবে বিভোর ! বলিতেছেন ;—

“সখি ! সে বন কত দূর !

(যে বনে আমার শ্রাম সুন্দর !)

(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায় !)

(আমি চলিতে যে নারি !)”

এখন জগৎ ভুল হ’য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্রের সম্মুখে, কিন্তু
নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় ব’সে আছেন, কিছুই হুঁস নাই । এখন
যেন প্রাণ ঈশ্বরে গত হ’য়েছে ! ‘মদগত-অন্তরাত্মা’ ।

‘গোরাপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা’ !—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হকার
দিয়া দণ্ডায়মান ! আবার বসিতেছেন ; বসিয়া বলিতেছেন ;—

“ঐ একটা আলো আস্ছে দেখতে পাচ্ছি ;—কিন্তু কোন্ দিক দিগে
আলোটা আস্ছে এখনো বুঝতে পারছি না ।”

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গীত ।

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—

মোহিলে প্রাণ ।

সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে—

কোথায় আমি অতি দীন হীন ।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে ।
আবার নিমীলিত নেত্র ।—স্পন্দহীন দেহ । সমাধিস্থ ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, “আমাকে কে লয়ে যাবে ?” বালক যেমন
সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ !

অনেক রাত হইয়াছে । ফাক্তন কৃষ্ণাদশমী ;—অন্ধকার রাত্রি । ঠাকুর
দক্ষিণেশ্বরে সেই কালীবাড়ীতে যাইবেন ।

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিবেন । ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া । তিনি উঠিতে-
ছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠানো হইতেছে । এখনো গর্গর যাতোয়ারা ।

গাড়ী চলিয়া গেল । ভক্তেরা—যে যার বাড়ী যাইতেছেন ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

[সেবকহৃদয়ে ।]

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণছবি,
স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের ত্রায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—
কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন । কেহ সরস বসস্তানিল
সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,—

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—

মোহিলে প্রাণ ।

মণি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছেন, “সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক’রে
আসেন ? অনন্ত কি শান্ত হয় ? বিচার তো অনেক হ’ল । কি বুঝলাম, বিচারের
দ্বারা কিছুই বুঝলাম না !

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ ব’ল্লেন, ‘যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তলাভ
হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই ।’ তাও বটে ! এই তো এক

ছটাক বুদ্ধি ; এর দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা ! একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে ? তবে অবতার বিশ্বাস কিরূপে হয় ? ঠাকুর ব'ল্লেন ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ ক'রে, তাহ'লে এক দণ্ডেই বুঝা যায় ! Goethe মৃত্যু-শয্যায় বলেছিলেন, "Light ! More Light !" তিনি যদি দপ্ ক'রে আলো জ্বলে দেখিয়ে দেন ! তবে—

“ছিদন্তে সর্বসংশয়াঃ”

“যেমন Palestine এ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগোরাঙ্ককে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন ।

“যদি দপ্ ক'রে তিনি না দেখান্ তা হ'লে উপায় কি ? কেন ? যে কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব'ল্ছেন ও কথা, সে কালে অবতার বিশ্বাস ক'রবো । তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস !—গুরুবাক্যে বিশ্বাস ! আর

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।

এসমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা ॥”

“আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বররূপায়—বিশ্বাস হ'য়েছে ;—আমি বিশ্বাস ক'রবো ; অন্তে যা করে করুক—আমি এই দেবতুল্য বিশ্বাস কেন ছাড়বো ? বিচার থাক্ । জ্ঞান চচ্চড়ি ক'রে কি আর একটি Faust হতে হবে ? আবার কি গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, ও আর একজন Faust একাকী ঘরের মধ্যে ‘হায়, কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বুঝা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্’ ; এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিবে ? না আর একজন Alastor অজ্ঞানের বোঝা বহিতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে ? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ ক'রতে যাবার প্রয়োজন নাই । আর, এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধ'রুলো না ব'লে, মরিতে যাবারও দরকার নাই । বেশ কথা,—~~গুরুবাক্যে বিশ্বাস~~ বিশ্বাস । হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না । যা হবার নয়, তা খুজ'তে যাওয়াইও না । আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, ‘যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি ; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই !’ কৃপা ক'রে এই আশীর্বাদ কর ।

আবার, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন ।

ভাবিতেছেন,—“কি ভালবাসা ! গিরীশ থিয়েটারে চ’লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে ! শুধু তা নয় । এমনও ব’লেছেন না যে, ‘সব ত্যাগ কর—আমার জন্ম গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ ক’রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর’ ! বুঝেছি—এর মানে এই যে সময় না হ’লে ছাড়লে, কষ্ট হবে ; ঠাকুর যেমন নিজেকে বলেন, ঘায়ের মামুড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত প’ড়ে কষ্ট হয় ; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামুড়ী আপনি খসে প’ড়ে যায় । সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণি সংসার ত্যাগ কর । ইনি সদৃশ, অহেতুক কৃপাসিক্ত, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশি দিন করিতেছেন ।

“আর গিরীশের কি বিশ্বাস ! দু দিন দর্শনের পরই ব’লেছিলেন, “প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ-দেহ ধারণ ক’রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্ম !” গিরীশ ঠিক তো ব’লেছেন, ঈশ্বর মানুষ-দেহ ধারণ না ক’রলে, ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে ; কে জানিয়ে দেবে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধ’রে তুলবে ; কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী ক’রবে ? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদগতান্তরাঙ্গা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাঁরা কি ক’রে দিন কাটাবেন ? তাই ‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে !’

“কি ভালবাসা !—নরেন্দ্রের জন্ম পাগল, নারায়ণের জন্ম ক্রন্দন ! বলেন ‘এরা ও অগ্রাণু ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্ম দেহ ধারণ করে এসেছে’ ! এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখছি ঈশ্বরপ্রেম ! ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অগ্রভাবে স্পর্শ করে নাই ; বিষয় কর্ম ক’রে, এদের লোভ অহঙ্কার হিংসা ইত্যাদি ক্ষুতি হয় নাই ; তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ । কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে ? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি ; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত ; কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত । তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ব’লে সেবা করেন । তাদের নাওয়ান্, শোয়ান্, তাদের দেখিবার জন্ম কাঁদেন ; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্ ; লোকের খোসামোদ ক’রে বেড়ান্, কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী ক’রে আনতে ; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক’রে খাওয়াইও তাহ’লে তোমাদের ভাল হবে । একি মায়িক স্নেহ ?

না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম ? মাটির প্রতিমাতে এতো ঘোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয় ; আর শুদ্ধনরদেহে কি হয় না ? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায় ! জন্ম জন্ম সাক্ষোপাঙ্গ !

“নরেন্দ্রকে দেখতে দেখতে বাহুজগৎ ভুলে গেলেন ; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন ; (apparent man) বাহ্যিক মনুষ্যকে ভুলে গেলেন ; (Real man) প্রকৃত মনুষ্যকে দর্শন ক’রতে লাগলেন ; অথও সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাকে দর্শন ক’রে তখনও অবাক স্পন্দহীন হ’য়ে চুপ ক’রে থাকেন, কখনও বা ‘ওঁ’ ‘ওঁ’ বলেন, কখন বা মা মা ক’রে বালকের মত ডাকেন, নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক’রে পাগল !

“নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ’য়েচে ! ঠাকুরের দিব্য চক্ষু ; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হ’তে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা ত নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ ক’রে আলো জ্বলে দেখিয়ে দেন না ! তাই বুঝি ঠাকুর ব’লেন—

‘মান কয়লি ত কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি।’

“আত্মীয় হ’তে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান ক’রবে না, ত কার উপর অভিমান ক’রবে। ষষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা ! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন !”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

পঞ্চদশ খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার
সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে
আনন্দ ও কথোপকথন ।

22nd OCTOBER 1885.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[গৃহস্থশ্রমকথাপ্রসঙ্গে ।]

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথি । সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন
ধরিয়া মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে । দশমীতে বিজয়া ও তদু-
পলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ
ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্তী সেই শ্রামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করি-
তেছেন । শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার (Cancer) । বলরামের
বাড়ীতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন । তাঁহাকে
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য । কবিরাজ এ প্রশ্নের
উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন । ইংরাজী ডাক্তারেয়াও রোগটি
অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা
করিতেছেন ।

আজ বৃহস্পতিবার—২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ । শ্রামপুকুরস্থিত
একটি দ্বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, একটি দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা
রচনা হইয়াছে—তাহাতে উপবিষ্ট । ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন । ঈশান বড় দানী

পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন, আর সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন । পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন । ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয় সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের গায় ব্যবহার করেন ।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে । বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সূখা ঢালিয়াছেন । ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক । অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন । সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রাহিয়াছেন । শুনবেন, তিনি কি বলেন । দেখিবেন, তিনি কি করেন ।

ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

[নিলিপ্ত সংসারী ।]

“যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ ! যেমন কারু মাথায় দু মোণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে । মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে । খুব শক্তি না থাকলে হয় না ।

“যেমন পাকাল মাছ পাকৈ থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাক নাই ! পান-কৌটী জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না ।

[নিলিপ্ত হ'বার উপায় ।]

“কিন্তু সংসারে নিলিপ্তভাবে থাকতে গেলে, কিছু সাধন করা চাই । দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক, তিন মাস হোক বা এক মাস হোক । সেই নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা ক'রতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্ম প্রার্থনা ক'রতে হয় । আর মনে মনে ব'লতে হয় আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনীর বলি, তারা দুদিনের জন্ম ! ভগবান আমার একমাত্র আপনীর লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব ; হায় ! কেমন ক'রে তাঁরে পাব !

“ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায় । যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না ।

“সংসার জলের স্বরূপ, আর মাতৃশের মনটা যেন দুধ । জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে ! তাই নির্জনে স্থানে দই পাতে

হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ'লে জলে মিশবে না; নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে থাকবে।

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব'লেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত, তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কোরবো। আমি বল্লম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বলেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হ'য়ে, উর্দ্ধপদ ক'রে কত তপস্বী করেছিলেন! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হ'বে হতে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জনে বাস চাই। নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে, তবে গিয়ে সংসার ক'রতে হয়। দই নির্জনে পাতে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না।

“জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটা নাম বিদেহ;—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসার থেকেও জীবমুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

“জনক ভারী বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কৰ্ম!

[সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান।]

“যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তাঁর উত্তর এই যে দুইই এক জিনিস। এটাও জ্ঞান উটাও জ্ঞান—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।

“মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হ'লে সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য।)

“খই যখন ভাজা হয় ছুচারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোজার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হোতে পারে। (সকলের হাস্য।)

“জনকরাজার সভায় একটা ভৈরবী এসেছিল। স্বীলোক দেখে জনকরাজা

হেঁটমুখ হ'য়ে, চোকনীচু ক'রে ছিলেন । ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিলেন, 'হে জনক ! তোমার এখনও জ্ঞানলোক দেখে ভয় !' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়,—তখন জ্ঞীপুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না ।

“যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না । চক্ষে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না ।

[জ্ঞানের পর কৰ্ম—লোকসংগ্রহার্থ ।]

“কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্ত কৰ্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি । লোক-শিক্ষার জন্ত শক্তি থাকা চাই । ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন । নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্ত বিচরণ ক'রে বেড়াতেন । তাঁরা বীরপুরুষ ।

“হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে । Steam Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয় ।

“নারদাদি আচার্য্য বাহাদুরি কাঠের মত, Steam Boatএর মত ।

“কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুছে ব'সে থাকে পাছে কেউ টের পায় । (সকলের হাস্য) । আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায় ।

“নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্ত জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি ল'য়ে ছিলেন ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । যুগধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে ।]

ডাক্তার । জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে । তখন ভক্তি দরকার হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে । জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায় । (সকলের হাস্য) ।

ডাক্তার । কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না । বেশার ঢুকতে পারে না । জ্ঞান চাই ।

সেজো বাবু } রাণী রাসমণীর জামাতা ও প্রথম সেবক ও 'রসদার'।

মথুরসম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি—

প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠা ৩, ৪ ; ওরাধাকান্তের গয়না চুরী ৬০ ; দেবেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ১৭৭ ; চল
হালদারের কথা ২৩৯ ; সঙ্গেগমন ও পণ্ডিতদের সহিত ঠাকুরের বিচার ২৪৭ ; 'তুমি মানো
আর নাই মানো' ২৪৮—৯।

৫



দ্বিতীয় ভাগ—মথুর সঙ্গে কাশীতীর্থ ও রাজা বাবুদের বাড়ীতে ঠাকুরের ক্রন্দন ৪ ; গড়ের মাঠে
বেলুন দর্শনকালে ঠাকুরের সমাধি ৫৭ ; দান মুখুয্যের বাড়ী ৬৩, ৬৪ ; নানকপন্থী সাধুর গীতা-
পাঠ ৭৫, ৮৬ ; 'আ একজন বড়মানুষ পেছনে দাও' ৯৪ ; সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা ও ভগবান
দানের সঙ্গে দেখা ১২৯ ; আদি সমাজে শ্রীযুক্ত কেশব মেননের সঙ্গে দেখা ১৭৬।

তৃতীয় ভাগ—ঠাকুরকে মথুরের সাঁচা জরীর পোনা ক প্রভৃতি প্রদান ২১, ২২ ; সঙ্গে কাশীধাম ও
শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ৩১ ; ঠাকুরের অর্ঘ্য প্রদান ১৫৯ ; সেজোবাবুর ভাবাবস্থা ১৭৮।

চতুর্থ ভাগ—বিড়ালকে লুচি খাওয়ানো ও গাজাপ্তীর পত্র ৩৯ ; ঠাকুরের মধ্যে ঈশ্বরী দর্শন ৪৯ ;
জানব'জারে একঘরে শয়ন ৭৯ . তালক লিখে দিতে চাহিয়া ১৯৬ . শাক্তমিন্দায় বৈষ্ণবসঙ্গ



শম্ভুচন্দ্র মল্লিক ।

ইহার বাগানবাটি কালীবাড়ীর অতি নিকটবর্তী । এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই যাতায়াত করিতেন ।

শম্ভু মল্লিক সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি :—

১ম ভাগ—পৃষ্ঠা—৪৬, ১২৭, ২৫২ । ২য় ভাগ—পৃষ্ঠা—১৮৮ । ৩য় ভাগ—পৃষ্ঠা—৭৪, ২৩৭ । ৪র্থ ভাগ—পৃষ্ঠা—৮৫, ৯৯, ১৯৪, ২২৬, ২৮২, ২৮৯, ৩১১ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে । একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'রতে বেরিয়েছিল; পুরীর কোন পথ সে জানতো না;—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল । পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রত । তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয় ঐ পথে যাও ।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে । দেখ, না জান্লেও কেউ না কেউ ব'লে দেয় ।

ডাক্তার । সে ভুলে তো গিছিল !

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায় ।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার !

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি সাকার আবার নিরাকার । একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গিছিল । জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার । হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠাণ্ডা কি না । একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দুখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই ! আবার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধার লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল । তখন সন্ন্যাসী বুঝল যে, ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার ।

“কিন্তু এটা ধারণা করা বড় শক্ত । যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন ? এ সন্দেহ মনে উঠে । আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন ?

ডাক্তার । যিনি আকার ক'রেছেন, তিনি সাকার । তিনি আবার মন ক'রেছেন, তাই তিনি নিরাকার । তিনি সবই হ'তে পারেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না । সাধকের জ্ঞান তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন । একজনের এক গাম্ভীর্য রঙ ছিল । অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো । সে লোকটা জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও । একজন হয়তো বলে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই । অমনি সেই লোকটি গাম্ভীর্য রঙে সেই কাপড়-খানি ছুপিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড় ।' আর একজন হয়ত বলে, আমার হলুদে রঙে ছোপান চাই ।' অমনি সেই লোকটি

সেই গাম্ভায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার হৃদে রঙ ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গাম্ভায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড় ।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গাম্ভা হ'তে ছোপান হত । এক জন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছিল । যার গাম্ভা, সে জিজ্ঞাসা কর'লে, "কেমন হে ! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে ?" তখন সে ব'লে, 'ভাই ! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও !' (সকলের হাস্য) ।

"এক জন বাহ্যে গিছিল—দেখলে গাছের উপর একটা সুন্দর জানোয়ার র'য়েছে । সে ক্রমে আর একজনকে ব'লে 'ভাই ! অমুক গাছে আমি একটা লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম ।' সে লোকটা ব'লে 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ !' আর একজন ব'লে 'না, না, সে সবুজ হ'তে যাবে কেন, সে যে হৃদে !' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'লে বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি । শেষে ঝগড়া । তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে । তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'লে আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি । তোমরা যা'য়া ব'লছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হৃদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয় । আবার কখন দেখি কোন রঙই নাই !

"যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি ? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন । নানা ভাবে দেখা দেন । তিনি সগুণ আবার নিগুণ (the Absolute) । যে গাছ তলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না । অত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায় ।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার । কি রকম জান ? যেন সূচিদানন্দ সমুদ্র । কুল-কিনারা নাই । ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায় —যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে ; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে* কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে, দেখা দেন । আবার জ্ঞানস্বরূপ উঠলে সে বরফ গ'লে যায় !"

ডাক্তার । সূর্য উঠলে বরফ গ'লে জল হয় ; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায় । তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (personal God) ব'লে বোধ হয় না । কি তিনি, মুখে বলা যায় না । কে ব'লবে ? যিনি ব'লবেন, তিনিই নাই ! তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না ! তখন ব্রহ্ম নিগুণ (the Absolute) । তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন । মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (the Unknown and Unknowable) ।

“তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র ; জ্ঞান—সূর্য । শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে । এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয় । জাহাজ চলে না । সেখানে গিয়ে আটকে যায় ।”

ডাক্তার । ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দসাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হ'য়েছে । যদি আরও বিচার ক'রতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই । জ্ঞানসূর্য্যেই বরফ গলে যাবে ;—তবে সেই সচ্চিদানন্দসাগরই রইল ।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি ; ভক্তের আমি ।]

“জ্ঞান বিচারের শেষ সমাধি হ'লে, আমি টামি কিছু থাকে না । কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন । 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না । আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয় ।

“গরু হাঙ্গা হাঙ্গা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ । সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই । কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে । তাতেও নিস্তার নাই । চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ার করে । অবশেষে নাড়ী ভুড়ী থেকে তাঁত হয় । ধুরুরির হাতে প'ড়ে যখন তুঁছ তুঁছ (তুমি, তুমি) করে তখন নিস্তার হয় !

“যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর ! তুমি কর্তা, আমি দাস তুমি প্রভু,—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি ।”

ডাক্তার । কিন্তু ধুরুরির হাতে পড়া চাই । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যদি একান্ত 'আমি' না যাস, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে । (সকলের হাস্য) ।

“সমাধির পর কাহারও কাহারও ‘আমি’ থাকে—দাস আমি, ভক্তের আমি । শঙ্করাচার্য্য ‘বিচার আমি’ লোকশিক্ষার জন্ত রেখে দিছিলেন ।

“ ‘দাস আমি,’ ‘বিদ্যার আমি’ ‘ভক্তের আমি,’ এরই নাম ‘পাকা আমি’ ।

“ ‘কাঁচা আমি’ কি জান ? আমি কর্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে !—এই সব ভাব । যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধ’রতে পার, তা হ’লে প্রথমে সব জিনিস পত্র কেড়ে লয় ; তার পর উত্তম মধ্যম মারে ; তার পর পুলিশে দেয় । বলে, ‘কি ! জানে না, কার চুরি করেছে !’

[বালকের ‘আমি’ ।]

“ঈশ্বর লাভ হ’লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয় । ‘বালকের আমি’ আর ‘পাকা আমি’ । বালক কোন গুণের বশ নয় । ত্রিগুণাতীত । সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয় । দেখে ছেলে তমোগুণের বশ নয় । এই মাত্র ঝগড়া মারামারি ক’রুলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা ! আবার রজোগুণেরও বশ নয় । এই খেলা-ঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব প’ড়ে রইলো ; মার কাছে ছুটেছে ! হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প’রে বেড়াচ্ছে । খানিক ক্ষণ পরে কাপড় খুলে প’ড়ে গেছে ! হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় ক’রে বেড়াচ্ছে ! (হাস্য) ।

“যদি ছেলেটিকে বল, ‘বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে ?’ সে বলে ‘আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে ।’ যদি বল, ‘লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানি দাও না ।’ সে বলে, ‘না, আমার কাপড় আমার বাবা দিয়েছে ; না, আমি দোব না’ । তার পর ভুগিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও তা হ’লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ’লে যাবে । আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই । এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না । কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অল্প জায়গায় চ’লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ’ল । তাদের উপর তখন সব ভালবাসা প’ড়লো ; পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একবারে ভুলে গেল । তার পর জাত অভিমান নাই । মা ব’লে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা । তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামা-

রের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাতা খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পৌদে খাবে! আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হ'য়েছে কি না?

“আবার ‘বুড়োর আমি’ আছে (ডাক্তারের হস্ত)। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয় বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না;—হয়তো যত দিন বাঁচে, তত দিন যায় না। তার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; এই সব। ‘বুড়োর আমি’ কাঁচা আমি।”

[জ্ঞান কাহাদের হয় না।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিচার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটা সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

[সত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ; ইন্দ্রিয়সংযমের উপায়।]

“তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

“পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুস্তকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটা লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না; হুমান লক্ষা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে!

“আবার তমোগুণের আর একটা লক্ষণ, কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হ'ব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।”

ডাক্তার । ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত । ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও । কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একবারে বন্ধ ক'রতে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না ।

“নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না ! যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের আলপথে চ'লছে, সে ছেলে বয়ং অসাবধান হ'য়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে । কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না ।”

ডাক্তার । কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা নয় । মহাপুরুষদের বালক স্বভাব । ঈশ্বরের কাছে তারা সর্বদাই বালক । তাদের অহঙ্কার থাকে না । তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয় । এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

[বিচারপথ ও আনন্দপথ ; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ।]

ডাক্তার । আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায় ? রিপু বশ না হ'লে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি যা ব'লছো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে । ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার । আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে ।

“আবার ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায় । যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, তাহ'লে ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা ক'রে ক'রতে হয় না । রিপুবশ আপনা আপনি হ'য়ে যায় ।

“যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার ক'রে বেড়াতে পারে, না সুখ-সন্তোষ ক'রতে পারে ? বাছলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে ?

ডাক্তার (সহাস্তে) । তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না গো ! ভক্ত কিন্তু বাছলে পোকার মত পুড়ে মরে না । ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো । মণির আলো খুব

শ্রামপুকুর বাটী । ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৩৯

উজ্জল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল । এ আঘাতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয় !

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন ।]

“বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায় । কিন্তু এ পথ বড় কঠিন । আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই ; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই ; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি স্থখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা । কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন । কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক’রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি ! এ সব কথা বলা সাজে না । আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবে তো !

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ; ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী ।]

“অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিজ্ঞা হয় না । কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল । কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক ভফাৎ ।

“আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না ; কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল ব’লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয় । সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান । কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত । নিজে খেলছে । নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না । কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত । তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান । নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব’লে দিতে পারে !”

ডাক্তার (ভক্তদিগের প্রতি) । বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ’তো না । Faraday communed with Nature প্রকৃতিকে ফ্যার্যাডে নিজে দর্শন করতো, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরেছিল । বই পড়ে বিজ্ঞা হ’লে অত হ’ত না । Mathematical formulæ only throw the brain into confusion ;—Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয় ।

[ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য (Divine Wisdom and Book-learning.)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । এখন পঞ্চবটীতে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে আমি মাকে ডাকতুম্, আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা ! আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে ! আরও কত কি, তা বলবো !

“আহা ! কি অবস্থাই গেছে !” ঘুম যায় ! এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন ;— গীত ।

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,

যোগে—যোগে জেগে আছি !

এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ;

ঘুমেতে ঘুম পাড়ায়েছি !

“আমি তো বই টাই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে আমায় সবাই মানে । শত্ৰুমল্লিক আমায় ব'লেছিল, ‘ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং ।’ (সকলের হাস্য) ।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল । তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন । ডাক্তার উহা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি) । তুমি বড় বদলোক ! আমায় কি রোজ থিয়েটার যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । কি ব'ল্ছে, আমি বুঝতে পারছি না । মাষ্টার । ও'র থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[অবতারকথাপ্রসঙ্গে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) । তুমি কিছু বল না ; এ (ডাক্তার) অবতার মান্ছে না ।

ঈশান । আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'রবো । বিচার আর ভাল লাগে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । কেন ? সঙ্গত কথা ব'ল্বে না ?

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি) । অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম । কাকভূষণী রামচন্দ্রকে প্রথম অবতার ব'লে মানে নাই ! শেষে তখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখলে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হ'লো । রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেলেন । ভূষণী তখন দেখে যে, সে তার গাছে ব'সে রয়েছে !

“অহঙ্কার চূর্ণ হ'লে তবে কাকভূষণী জানতে পারলে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড । তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত ; আবার জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি ।

[অবতার ও জীব ; জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ।]

[Limited powers of the Conditioned]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই সরাট, তিনিই বিরাট । যারই নিত্য, তারই লীলা । তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, একথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ব'লতে পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে ? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ?

“তাই সাধু মহাত্মা যারা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস ক'তে হয় । সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন ; যেমন উকীলরা মোকদ্দমা লিয়ে থাকে । তোমার কাকভূষণীর কথা কি বিশ্বাস হয় ?”

ডাক্তার । যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস ক'ল্লুম । ধরা দিলেই চুষে যায় কোন গোল থাকে না । রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি ? প্রথমে দেখ বালী-বধ । লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো । এতো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয় ।

গিরীশ ঘোষ । মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন ।

ডাক্তার । তার পর দেখ, সীতাবর্জ্জন ।

গিরীশ । মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না ।

[Science, না মহাপুরুষের বাক্য ?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি) । আপনি অবতার মানছেন না কেন ? এই আপনি বলেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার । এই আপনি ব'লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হ'তে পারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা

যে ওঁর Scienceএ (ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই ! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয় ? (সকলের হাস্য) ।

“একটা গল্প শোন । একজন এসে ব’লে, ওহে ! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমকের বাড়ী হুড়মুড়্ ক’রে ভেঙ্গে প’ড়ে গেছে । যাকে ও কথা বলে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে । সে বলে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি । খপরের কাগজ পড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নাই । তখন সে ব্যক্তি বলে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না । কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই ! ও সব মিছে কথা ।” (সকলের হাস্য) ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতে হবে । আপনাকে মানুষ মানতে দেব না । বলতে হবে Demon or God (হয় সয়তান নয় ঈশ্বর) ।

[সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সরল না হ’লে ঈশ্বরে চট্ ক’রে বিশ্বাস হয় না । বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর । বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব । (ভক্তদের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । মহাশয়, কি বলেন ? কুরুটের কি জ্ঞান হয় ? ডাক্তার । রাম বলো ! তাও কখন হয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশব সেন কি সরল ছিল ! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালীবাড়ীতে) গিছিল । অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা অতিথ-কান্দালদের কখন খাওয়া হবে ? বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে । যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ ক’রে দুধ দেয় । আর যে গরু শাক পাতা, খোসা, ভূষী, জাব, যা দাও, গব্, গুব্ ক’রে খায়, সে গরু হুড়মুড়্ ক’রে দুধ দেয় । (সকলের হাস্য) ।

“বালকের মত বিশ্বাস না হ’লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । মা ব’লেছেন, ‘ও তোর দাদা’, বালকের ওমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা । মা ব’লেছেন, জুজু আছে ; তো ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে । এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয় । সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না ।”

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি) । গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয় । আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত । শেষে আমার ভারী ব্যারাম । তখন ভাবলুম, এর কারণ কি ? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি, খেয়েছিল । তখন মহা মুস্কিল ! লক্ষ্যে যেতে হোলো ! শেষে বার হাজার টাকা খরচ ! (সকলের হো হো করিয়া হাস্য) ।

“কিসে কি হয় বলা যায় না । পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ ক'রেছিল—ঘুঙ্‌ড়ী কাশী (whooping-cough) ! আমি দেখতে গি'ছিলাম । কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক ক'তে পারি নাই । শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজেছিল ; যে গাধার দুধ সেই মেয়েটি খেতো । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । কি বলে গো ! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অসুখ হ'য়েছে ! (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য) ।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে) । জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল । তা ডাক্তারেরা পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেলেন্তারা (blister) লাগিয়ে দিল । (সকলের হাস্য) ।

*

*

*

*

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাসত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার । রোগ লেগেই আছে । সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ ক'ত্তে হয় । শুধু শুন্নে কি হবে ? ঔষধ খেতে হবে,—আবার আহারের কটকেনা ক'ত্তে হবে । পথ্যের দরকার ।

ডাক্তার । পথ্যতেই সারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈজ্ঞ তিন প্রকার ; উত্তম বৈজ্ঞ, মধ্যম বৈজ্ঞ, অধম বৈজ্ঞ । যে বৈজ্ঞ এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে’ এই কথা বলে চ'লে যায়, সে অধম বৈজ্ঞ—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না । আর যে বৈজ্ঞ রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে ! ঔষধ না খেলে, কেমন ক'রে ভাল হবে ? লক্ষ্মীটা খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও’,—সে মধ্যম বৈজ্ঞ । আর যে বৈজ্ঞ, রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈজ্ঞ ।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈজ্ঞানিক বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই ।

“বৈজ্ঞানের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, তিনি অধম আচার্য্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা ক’তে পারে, অনেক অল্পনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য ।

[শ্রীলোক ও সন্ন্যাসী ; সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। শ্রীলোকের পট পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। শ্রীলোক কিরূপ জান?—যেমন আচার তেঁতুল। মনে ক’লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না।

“কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়;—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যত দূর পার শ্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ’য়ে থাকবে। মাঝে মাঝে নির্জনে স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা ক’রবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে! তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ’য়ে থাকতে পারবে। দুই একটি ছেলে হ’লে শ্রীপুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাকবে; আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা ক’রবে, যাতে ইন্দ্রিয়-স্থিতে মন না যায়,—ছেলে পুঁজে আর না হয়।”

গিরীশ (সহাস্ত্রে ডাক্তারের প্রতি)। আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা র’য়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা ক’তে যাবেন না।

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী! যে পরমহংস হ’য়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্মনাশ ব’লে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ হ’য়ে যায়,—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম ক’তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

শ্যামপুকুর বাটী। ঈশান, ডাক্তার সরকার প্রতিভা ভক্ত সঙ্গে। ২৪৫

ডাক্তার (মাষ্টার, গিরীশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্ত যদি মনে কর, তা হ'লে নয়! তবে আপনার লোক ব'লে যদি মনে কর, তাহ'লে আমি তোমাদের।

[অহৈতুকী ভক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। একটা আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটা যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল! প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহস্থ এ সব কিছুই চাই না! এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম ক'রে থাকে দেখেছি; ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকুরী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল ক'রে দাও,—এই সব।

* * * *

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যে অস্থখ তোমার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাশ্ব)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অস্থখটা ভাল ক'রে দাও; দেখ, তাঁর নাম-গুণ ক'র্তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান ক'ল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি এক ঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন বোলে, কখন ঝালে, অস্থলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন তাঁর নাম ক'রে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই। ১৭

* * * *

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া এই দুটো দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক চাই। তিনি ত
অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুন্বেনই শুন্বেন। ব্যাকুল হ'য়ে সাকার-
বাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই)
পাবে।

“মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও; মিষ্ট
লাগবে। তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।”

ডাক্তার। সে তোমার চেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে, ডাক্তারের প্রতি)। আমার কোন শালা চেল
নাই। আমিই সকলের চেল। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস।
—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

“চাঁদা মামা সকলেরই মামা।” (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

ষোড়শ খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত মাষ্টার, শ্রীযুক্ত ডাক্তার
সরকার, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি
ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ ।

25th OCTOBER 1885,

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি । ইংরাজি ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় সেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন । গলার পীড়া (Cancer) চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন । আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন ।

মাষ্টারকে ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে । আজ সকালে বেলা ৬।০ টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন আছেন ?” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “ডাক্তারকে ব’ল্বে, শেষরাত্রে একমুখ জল হয় ; কাশি আছে” ইত্যাদি । “জিজ্ঞাসা ক’রবে নাইবো কি না ?”

মাষ্টার সাতটার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন । ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও ছুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন ।

ডাক্তার (বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি) । মহাশয়, রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হ’য়েছে ;—ঘুম নাই । এখনও পরমহংস চ’লছে (সকলের হাস্য) ।

ডাক্তারের একজন বন্ধু (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, শুন্তে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখছেন আপনার কি বোধ হয় ?

ডাক্তার। As man, I have the greatest regard for him.

মাষ্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি)। ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে অনেক দেখছেন।

ডাক্তার। অনুগ্রহ !

মাষ্টার। আমাদের উপর অনুগ্রহ ; পরমহংসদেবের উপর বলছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে ! তোমরা জানো না, আমার, actual loss হ'ছে, রোজ রোজ দুই তিনটে callএ যাওয়াই হ'ছে না ! তার পর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর ফি লই না ;—আপনি গিয়ে fee নেবো কেমন কোরে ?

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন ; ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রেছেন।'

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)। ম—চক্রবর্তী আপনার এখানে আগে আসতেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী scienceএর lecture দিতেন। তিনি শুন্তে আসতেন ;

ডাক্তার। বটে ! লোকটার কি তমো ! দেখলে,—আমি নমস্কার করলুম as God's Lower Third ? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে। তুমি ও কথাটা mark ক'রেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে ব'সেছেন' ?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে ক'রুলে নিজে ব্যারাম আরাম ক'ন্তে পারেন।

ডাক্তার। ঙ্গ ! তা কি হয় ! আপনি ব্যারাম ভাল করা ! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancerএর ভিতর কি আছে !—আমরাই আরাম করতে পারি না !—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম ক'রবেন !

(বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devoteeএর মত সেবা ক'রছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[সেবক-সঙ্গে ।]

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন । খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা তিনটার সময় আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন ।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ ক'রেছে ।
শ্রীরামকৃষ্ণ ; কি হ'য়েছে ?

মাষ্টার । ‘আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে
ষসেছেন,’—এ কথা কাল শুনে গিছলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কে ব'লেছিল ?

মাষ্টার । ম—চক্রবর্তী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তার পর ?

মাষ্টার । তা ম—চক্রবর্তীকে বলে, ‘তমোগুণী ঈশ্বর’, (God's Lower Third) । এখন ডাক্তার ব'লছে ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ) আছে ।
(পরমহংসদেবের হাশ্ব) ।

মাষ্টার । আবার আমার বলে, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে আর
পরমহংসের ভাবনা । বেলা আটটার সময় বলে, ‘এখনো পরমহংস চ'লছে !’

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । ও ইংরেজী প'ড়েছে, ওকে বলবার যো
নাই আমাকে চিন্তা কর ; তা আপনিই ক'রছে ।

মাষ্টার । অবার বলে—As man I have the greatest regard for
him ; এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর
সম্ভব ভক্তি আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর কিছু কথা হ'লো ?

মাষ্টার । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?’
ডাক্তার ব'লে, ‘বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু ; আবার আজ যেতে
হবে, আর কি বন্দোবস্ত !’ (শ্রীরামকৃষ্ণের হাশ্ব) । আরো ব'লে, “তোমরা
জানো না যে, আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে ;—দুই তিন জায়গায়
রোজ যেতে হয় !”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[বিজয়াদিভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে ।]

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন । সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত । বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন । আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পহুঁছিয়াছেন । আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন । অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—নরেন্দ্র, ম—চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত ।

ম—চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি) । মহাশয়, তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন ।

বিজয় । কি ব'লবো ! দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এই খানেই সব । কেবল মিছে ঘোরা ! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত । এই খানেই পূর্ণ ঘোল আনা দেখছি !

ম—চক্রবর্তী । ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্ ইনিই বসান্ !

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । দেখ বিজয়ের অবস্থা কি হ'য়েছে ! লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে ! আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্তে পারি । বলতে পারি পরমহংস কি না ।

ম—চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি) । মহাশয় ! আপনার আহার কমে গেছে ?

বিজয় । হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে ।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম । আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি ?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না । খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ।

বিজয় । ধরা না দিলে ধরা শক্ত । এখানে ঘোল আনা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেদার * ব'লে, অল্প জায়গায় খেতে পাই না,—এখানে

এসে পেটভরা পেলুম !

ম—চক্রবর্তী । পেটভরা কি ? উপচে পড়ছে !

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্ঘ্য অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন । ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত । একজন পরম ভক্ত ।

বিজয় । (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । বুঝেছি আপনি কে ! আর বলতে হবে না !

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) । যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই ।

বিজয় । বুঝেছি ।

এই বলিয়া বিজয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন ।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন । ঈশ্বার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন । কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতে লাগিলেন । ঈশ্বার যেমন ভাব !

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্তী সাধনরতনে গাহিলেন—দেখ দেখ প্রেমমূর্তি—

ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন—

“তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিতম্ ।”

নবগোপাল কাঁদিতে লাগিলেন ।

আর একটি ভক্ত গাহিল—

গীত ।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,

পরাম্পর তুমি সারাংসার ।

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,

মঙ্গলের তুমি মূলাধার ।

নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,

উচ্ছসিত শোভায় শোভায়,

মহাকবি আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,

ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায় ।

তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর কুচি,

গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ।

ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্তন করে,

স্বথপূর্ণ চরাচর সাথে ।

কুস্মে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
 বজ্রবে রুদ্র তুমি ভীম ;
 তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মৃঢ়মতি,
 ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম ।
 আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
 কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা !
 তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
 হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা ।
 মিলি স্থর, নর, ঋতু, প্রণমে তোমায় বিভু,
 তুমি সর্ব মঙ্গল-আলয় ;
 দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
 দেও দেও ওপদে আশ্রয় ।

সেই ভক্তটী আবার গাহিলেন,—

বিষিট—(খয়রা) কীর্তন ।

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী ।
 মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ।
 বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
 ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি,
 (হরি হরি বলে)
 মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
 দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
 (আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল !)
 এখন আনন্দে মাতিয়া ছুবাছ তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি !

(ঝাঁপতাল ।)

টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি
 দূর ভেল জাতি কুলমান ;
 কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
 বঁধুয়া করিলা পয়ান ;

(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে,)

ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর,

নাহি যাত আপনা পসান,

প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,

এয়সাহি নূতন বিধান ।

(কিছু ভয় নাই ! ভয় নাই !)

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও ‘আশ্চর্য্য গণিত ।’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । কি একটা হয় আবেশে ; এখন লজ্জা হ’ছে । যেন ভূতে পায় ; আমি আর আমি থাকি না ।

“এ অবস্থার পর গণনা হয় না । গণতে গেলে ১:৭৮ এই রকম গণনা হয় ।

নরেন্দ্র । সব এক কি না !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ; এক দুয়ের পার ! *

ম—চক্রবর্তী । আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিতম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হিসাব পচে যায় ! পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না । তিনি শাস্ত্র,—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের—পার । হাতে একখান বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ’লেও তাকে রাজর্ষি ব’লে কই । ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না । শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো ? একজন চিঠি লিখেছিল, ‘পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে’ । যে চিঠি পেল, সে চিঠি পড়ে ১৫ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে । আর চিঠির কি দরকার ?

[অবতারের প্রয়োজন ।]

বিজয় । সন্দেশ পাঠান হয়েছে, বোঝা গেছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষদেহ ধারণ করে, ঈশ্বর অবতীর্ণ হন । তিনি সর্ব-স্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ’লে জীবের আকাজক্ষা পূরে না ; প্রয়োজন মেটে না । কি রকম জানো ? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে ; শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো ; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয় । (হাস্য)

* এক দুয়ের পার—The Absolute as distinguished from the Relative.

ম—চক্রবর্তী । দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিল্পে মুখ দিলে কি হবে ?
বাঁটে মুখ দিতে হবে । (সকলের হাস্য ।)

বিজয় । কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক উদিক চু মারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ
রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয় । (সকলের হাস্য) ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ভক্ত-সঙ্গে প্রেমানন্দে ।]

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্ত
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন ।

ডাক্তার সরকার । কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে । কেবল
তোমার জন্ত ভাবছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে । আরো কত কি ভাবছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর
যেন কাঁটা বিঁধেছে ?

ডাক্তার । সকালে সব থপর পেয়েছি ।

শ্রীম—চক্রবর্তী তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন । বলি-
লেন যে লঙ্কাদীপে ‘laughing man’ নাই । ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা
হবে ; ওটা ‘inquire’ করতে হবে । (সকলের হাস্য) ।

[ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

ডাক্তারী কর্মের কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । ডাক্তারী কর্ম খুব উচু কর্ম ব’লে
অনেকের বোধ আছে । যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক’রে
কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ । কাজটাও মহৎ । কিন্তু টাকা লয়ে এ
সব কাজ ক’রতে ক’রতে মানুষ নির্দয় হ’য়ে যায় । ব্যবসার ভাবে টাকার
জন্ত হাগা বাহের রং এই সব দেখা !—নীচের কাজ ।

ডাক্তার । তা যদি শুধু করে, তা হ’লে কাজ খারাপ ব’ড়ে । তোমার
কাছে বলা গৌরব করা—

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা
হয়, তাহ’লে খুব ভাল ।

শ্যামপুকুর বাটী । সরকার, বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৫৫

“তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই,—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু ক’রে চ’লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

[সাধু ও সর্বজীবে দয়া।]

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়না দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি ক’রে ছুড়ে ছুড়ে ফেলি, আর ছাদে বাঁকে বাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ; সাধুরা পিপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর না।

নরেন্দ্র গাহিতে লাগিলেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।

গীত।

সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,
বরিশে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে।
এক তব নাম ধন অমৃত ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমেঘে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

আমায় দে মা পাগল ক’রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।

(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক’রে)

(ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে করো মাতোয়ারা,

ওমা ভক্তচিত্তইরা ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার এ পাগলাগারদে,

কেহ হাসে কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;

ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য,

ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,

হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা, মিশে তার ভিতরে ।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য ! সকলেই ভাবে উন্মত্ত । পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বলছেন, ‘আমায় দে মা পাগল ক’রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে’ । বিজয় সর্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন । ডাক্তার সম্মুখে । তিনিও দাঁড়াইয়াছেন । রোগীরও হুঁস নাই । ডাক্তারেরও হুঁস নাই । ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল । লাটুরও ভাব-সমাধি হইল । ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন, ষাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই ; সকলই স্থির, নিষ্পন্দ ;—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন । যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[ভক্ত-সঙ্গে ।]

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন । রাত আটটা হইয়া গিয়াছে । আবার কথাবার্তা হইতে লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । এই যা ভাবটাব দেখলে তোমার Scienceএ কি বলে ? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয় ?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । যেখানে এত লোকের হ’ছে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না ।

(নরেন্দ্রের প্রতি) । যখন তুমি গাচ্ছিলে ‘দে মা পাগল ক’রে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে’ তখন আর থাকতে পারি নাই । দাঁড়াই আর কি ! তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুল ; এই ভাবলুম যে display করা হবে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্তে) । তুমি যে অটল, অচল, সুমে-
কবৎ (সকলের হাস্য) তুমি গম্ভীরাত্মা, রূপসম্মতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ভোবাতে হাতী নামে, তা হ’লেই তোলপাড় হ’য়ে যায়, কিন্তু সায়েব

দীঘিতে হাতী নাম্লে তোলপাড় হয় না ; কেউ হয় তো টেরও পায় না ।
শ্রীমতী সখীকে বল্লেন, “সখি তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিস ; কিন্তু
দেখ, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই !” তখন বৃন্দা ব’ল্লেন,
‘সখি তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে । তোর হৃদয়ে বিরহ-
অগ্নি সदा জলছে ; চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে !’

ডাক্তার । তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নাই ! (সকলের হাস্য ।)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধজয় ।]

ক্রমে অন্য কথা পড়িল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা
করিতেছিলেন । কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়, সেই কথা হইতেছিল ।

ডাক্তার । তুমি ভাবে প’ড়েছিলে, আর এক জন দুষ্ট লোক তোমায়
বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল,—সে সব কথা শুনেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মাষ্টারের কাছে শুনেছ । সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার ।
সেজো বাবুর* কাছে প্রায় আস্তো । আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অঙ্ক-
কারে প’ড়ে আছি । চন্দ্রহালদার ভাবতো, আমি ঢং ক’রে ঐ রকম হয়ে থাকি,
বাবুর প্রিয়পাত্র হব ব’লে । সে অঙ্ককারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে
লাগলো । গায়ে দাগ হ’য়েছিল । সবাই ব’লে, সেজো বাবুকে ব’লে দেওয়া
যাক । আমি বারণ ক’রলুম !

ডাক্তার । এও ঈশ্বরের খেলা, ওতেও লোক শিখবে । ক্রোধ কি রকম
ক’রে বশীভূত ক’রতে হয় । ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখবে ।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ।]

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথা-
বার্তা হইতেছে ।

বিজয় । কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাক-
লেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হ’চ্ছে ।

নরেন্দ্র । guardian angel এর মত ।

বিজয় । ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি ! গা ছুঁয়ে !

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) সে তবে আর একজন ।

নরেন্দ্র । আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি । (বিজয়ের প্রতি)
তাই কি ক’রে ব’লবো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না !

* ‘সেজোবাবু’—রাসমণির জামাতা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন
ও শিষ্যের শ্রায় সেবা করিতেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

সপ্তদশ খণ্ড ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ,
মাস্টার, ছোট নরেন্দ্র, কালী, * শরৎ, রাখাল,
ডাক্তার সরকার প্রভৃতি অনেক ভক্তের
কথোপকথন ও আনন্দ ।]

26th OCTOBER, 1885.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পর দিন আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্তিক, ইংরাজী
২৬শে অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ । শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্রাম-
পুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন । ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করি-
তেছেন । তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ
লইয়া লোক সর্বদা যাতায়াত করে ।

শরৎকাল । কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা-পূজা হইয়া গিয়াছে । এ
মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন,
কেননা, তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া—কণ্ঠদেশে পীড়া, Cancer ।
সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইজিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য ।
হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন ।
এক্ষণে এই শ্রামপুকুরের বাটীতে আছেন । শিষ্যেরা প্রাণপণে ঠাকুর শ্রীরাম-
কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন । নরেন্দ্রাদি কোমারবৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই
মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-পথ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ
করিতে সবে শিখিতেছেন ।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন ;—শ্রীরাম-
কৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয় । -অহেতুককৃপাসিন্ধু ! দয়ার

* কালী (স্বামী অভেদানন্দ) এখন আমেরিকায় আছেন । শরৎ (স্বামী শারদানন্দ)
তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন । ইনি আর একটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ।

ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয় । শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার, কথা কহিতে একবারে নিষেধ করিলেন । কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন । তিনি বলেন, ‘আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে ।’

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামত পান করিয়া ডাক্তার একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন । তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন ।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মণ্ডার যাইবেন, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্ডারের প্রতি) । অসুখটা খুব হালুকা হ’য়েছে । খুব ভাল আছি । আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ’য়েছে ? তাহ’লে ঐ ঔষধটা খাই না কেন ?

মাণ্ডার । আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব’লবো, তিনি যা ভাল হয়, তাই বলবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন ক’চ্ছে ।

মাণ্ডার (কালীর প্রতি) । কালী বাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্তারে ।

কালী । এই যাব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্ডারের প্রতি) । ডাক্তারের ছেলেটা বেশ । একবার আস্তে বোলো ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[মাণ্ডার ও ডাক্তার সংবাদ ।]

মাণ্ডার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন ।

ডাক্তার (মাণ্ডারের প্রতি) । এই এক মিনিট হ’লো তোমার কথা ক’চ্ছিলাম । দশটায় আসবে ব’লে, দেড়ঘণ্টা ব’সে । ভাবলুম, কেমন আছেন, কি হ’লো ।

* ত্রিযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন । ঠাকুরের আর একটি অন্তরঙ্গ ।

ডাক্তার (বন্ধুর প্রতি) । ওহে সেই গানটা গাও ত ।

বন্ধু গাইলেন,—

গীত ।

কর তাঁর নাম গান,

যত দিন রহে দেহে প্রাণ ।

যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো ;

শ্রোত বহে প্রেমপীযুষবারি সকল জীবমুখকারী হে ।

করণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ;

যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে ।

উচ্চে, নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে ;

অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে জিজ্ঞাসে হে ।

চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ ;

নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে ।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি) । গানটা খুব ভাল : নয় ? ঐ খানটা কেমন ?

“অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে জিজ্ঞাসে !”

মাষ্টার । হাঁ, ওখানটা বড় চমৎকার ; খুব অনন্তের ভাব ।

ডাক্তার (সম্মুখে) । অনেক বেলা হ’য়েছে, তুমি খেয়েছো ত ? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ’য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী করতে বেরুই । না খেয়ে বেরুলে অস্থখ করে । ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়ানো মনে ক’রেছি ।

মাষ্টার । তা বেশ তো মহাশয় ।

ডাক্তার । আচ্ছা, এখানে না সেখানে ? তোমরা যা বল ।

মাষ্টার । মহাশয়, এখানেই হ’ক, আর সেখানেই হ’ক, সকলে আহ্লাদ ক’রে খাবে ।

মা কালীর কথা পড়িল ।

ডাক্তার । কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী । (মাষ্টারের উচ্চ হাস্য ।)

মাষ্টার । ও কথা কোথায় আছে ?

ডাক্তার । শুনেছি এই রকম । (মাষ্টারের হাস্য ।)

পূর্ব দিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল । ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন । সেই কথা হইতে লাগিল ।

ডাক্তার । ভাব ত দেখ্‌লুম । বেশী ভাব কি ভাল ?

মাষ্টার । পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে সে ভাব হয়, তাহা বেশী হ'লে কোন ক্ষতি হয় না । তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না ।

ডাক্তার । মণির জ্যোতিঃ ; ও যে reflected light !

মাষ্টার । পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না । ঈশ্বর অমৃতের সরোবর । তাঁতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না ; বরং মানুষ অমর হয় । অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে ।

ডাক্তার । হাঁ, তা বটে ।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু চারটি রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন । পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল । ডাক্তার চক্রবর্তীর অহঙ্কার, এই কথা তুলিলেন ।

মাষ্টার । পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে । অহঙ্কার যদি থাকে, কিছু দিনের মধ্যে আর থাকবে না । তাঁর কাছে বস্‌লে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয় । ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই । নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায় । দেখুন, বিজ্ঞানাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন । পরমহংসদেব তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাহুড়বাগানের বাড়ীতে । যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা হবে । বিজ্ঞানাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক একবার বাতি ধ'রে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন ; আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন ।

ডাক্তার । আচ্ছা এ'র বিষয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কি রকম মত ?

মাষ্টার । সে দিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন । তবে কথা ক'য়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না । আপনার মতের মত ।

ডাক্তার । হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও সব ভালবাসি না । মাথাও যা, পাও তা । তবে যার পা অগ্র জ্ঞান আছে, সে করুক ।

মাষ্টার । আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না । পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে । তিনি কাল আপনাকে বলছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী

বড়, তাতে হাতী নাম্লে জল নড়েও না । গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহন্তী নাম্লে তার কিছু ক'রতে পারে না । তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা ।'

ডাক্তার । I don't deserve the compliment. ভাব আর কি ? feelings ;—ভক্তি, আরও অন্যান্য feelings—বেশী হ'লে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না ।

মাষ্টার । Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম ক'রে—কেউ পারে না ; কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিষটা অপূর্ব সামগ্রী । Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখলাম । Stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক বা ঈশ্বর আলাদা ব'সে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়াছেন—theory of light. Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful.”

ডাক্তার । হাঁ ; আর দেখেছো, Stebbing Darwinism মানে, আবার Godও মানে !

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল ।

ডাক্তার । ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীর উপাসক ।

মাষ্টার । তাঁর 'কালী' মানে আলাদা । বেদ যাকে পরমব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন । মুসলমান যাকে আল্লা বলে, খৃষ্টান যাকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন । তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন । পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন ।

“তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটি গামলা ছিল ; তাতে রং ছিল । কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেতো । সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ক'রতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও ?'—লোকটি যদি ব'লতো সবুজ রং, তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবিয়ে কিরিয়ে দিত ; ও ব'লতো, 'এই লও তোমার সবুজ রঙে ছোপান কাপড় !' যদি কেহ ব'লতো লাল রং, তা হ'লে সেই গামলার কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'লতো 'এই লও তোমার লালে ছোপান কাপড় ।' এই এক গামলার রঙে সবুজ নীল হুন্দের সব রঙের কাপড় ছোপান হোতো । এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক ব'লে 'বাবু আমি কি রং চাই ব'লবো ? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ

শ্রামপুকুর বাটী! সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৬৩

আমায় সেই রং দাও' । সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতরে সব ভাব আছে,—
সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শাস্তি পায় ও আনন্দ পায় ।
তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে ?

ডাক্তার । All things to all men ! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার । পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে ? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার
ব্যবসা না ক'রলে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বুঝা যায় না ।
Painter না হ'লে Painterএর art বুঝা যায় না । মহাপুরুষের গভীর ভাব ।
Christএর জ্ঞান না হ'লে Christএর সব ভাব বুঝা যায় না । পরমহংসদেবের
এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা ব'লেছিলেন তাই,—'Be perfect as
your Father in heaven is perfect.'

* * * *

ডাক্তার । আচ্ছা, তাঁর অস্থখের তদারক তোমারা কিরূপ কর ?

মাষ্টার । আপাততঃ প্রত্যহ একজন superintend করেন, যাঁহাদের
বয়স বেশী । কোন দিন গিরীশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন
বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালী
বাবু; এই রকম ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তসঙ্গে ।]

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্রামপুকুরে যে
বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের
গাড়ী আসিয়া লাগিল । তখন বেলা ১টা হইয়াছে । ঠাকুর দোতলার ঘরে
বসিয়া আছেন । অনেক গুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ
ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি । সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ
মহাপুরুষের দিকে । সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের জায় রোজার সম্মুখে বসিয়া
আছেন । অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে । ডাক্তার ও
মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আজ
বেশ ভাল আছি ।'

ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল ।

[পণ্ডিত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে । ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটা অবস্থা হয় । তখন পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ ক'রে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে । তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয় । পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হ'লে তাকে খড়্ কুটো মনে হয় !

“রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক ক'রুছিল ; হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো ! তার পর তাকে বল্লুম, ‘তুমি কি ব'ল্ছো ? তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝবে ! তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে ! তোমার তো ভারি তেঁতে বুদ্ধি !’ আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো—আর আমার পা টিপতে লাগলো !

ডাক্তার । রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না ! আবার ফুল চন্দন লয় ! সত্য হিন্দু কি না !

মাষ্টার । (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু বলেছিলেন, আমি শাঁক ঘণ্টায় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । বন্ধিম তোমাদের এক জন পণ্ডিত । বন্ধিমের * সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি ? তা বলে, ‘আহার, নিদ্রা আর মৈথুন’ ! এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো । বল্লুম যে, ‘তোমার এ কি রকম কথা ! তুমি তো বড় ছ'্যাচ্ছা ! যা সব রাত দিন চিন্তা ক'রছো, আর কাজে ক'রছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ! মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে !’ তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো, ঘরে সঙ্কীর্ণন হ'লো । আমি আবার নাচলুম । তখন বলে মহাশয় ! আমাদের ওখানে একবার যাবেন । আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা । তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন । আমি হাসতে হাসতে ব'ল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে, গো ? ‘গোপাল’, ‘গোপাল’ যারা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি ?

ডাক্তার । ‘গোপাল গোপাল’ সে ব্যাপারটা কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । একটি শাকুরার দোকান ছিল । বড় ভক্ত । পরম বৈষ্ণব ।—গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা । সকলে

* কলিকাতা, বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরম ভক্ত শ্রীঅধরলাল সেনের বাড়িতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাট্টোয়ার সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল । বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন ।

বিশ্বাস ক'রে ঐ দোকানেই আসে; ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খন্দের এলে দেখতো, কোনও কারিগর ব'লছে, 'কেশব!', 'কেশব!' আর এক জন কারিগর খানিক পরে নাম করছে, 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর ব'লছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি'; তার পর কেউ ব'লছে 'হর', 'হর'। কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদারেরা সহজেই মনে করতো, এ শ্রাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে ব'লে, 'কেশব!'; তার মনের ভাব, 'এ সব (খন্দের) কে?' যে ব'লে 'গোপাল! গোপাল!' তার অর্থ এই যে আমি এদের বেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল (সকলের হাশ্র)। যে ব'লে 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (সকলের হাশ্র)। যে ব'লে 'হর', 'হর,'—তার মানে এই—তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল! (সকলের হাশ্র।)

“সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম; অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্য (সকলের হাশ্র)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হ'লে ব'লে, 'মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে, সে সব পড়া, বিছা, সব থু হ'য়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্থ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই ব'লছি, বই পড়লে পণ্ডিত হয় না।

[ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মূর্থের কণ্ঠে সরস্বতী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্য, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়! ও দেশে ধান মাপে 'রামে রাম', 'রামে রাম' এই সব বলতে বলতে। এক জন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, এমন সময়ে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কক্ষই ঐ, ফুরালেই রাশ ট্যাঁলে। আমিও যা কথা ক'য়ে যাই ফুরিয়ে আসে আসে হয়, যা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন!

“ছেলে বেলায় তাঁর আবির্ভাব হ'য়েছিল। এগারো বছরের সময়

মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম ! সবাই বল্লে, বেহুঁস হ'য়ে গিচ্‌লুম, কোন সাড়্‌ ছিল না । সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলুম । নিজের ভিতর আর এক জনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম । যখন ঠাকুর পূজা ক'রতে যেতুম, হাতটা অনেক সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম ! যে ছোকরা আমার কাছে থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না ; বলতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয় !”

—:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[Free will or God's Will ?]

[‘যন্ত্রারূঢ়’] ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি তো মুখ্য, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে ? আমি বলি, ‘মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি ঘর—তুমি ঘরনী ; আমি রথ—তুমি রথী ; যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি ; নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু’ । তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র ! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্র ধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা ক'রতে লাগল ; বলে এমন সতী হবে না । তখন শ্রীমতী ব'ল্লেন, ‘তোমরা আমার জয় কেন দাও ; বল কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয় ! আমি তাঁর দাসী মাত্র’ । আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি !

ডাক্তার । তার পর সাবধান হওয়া উচিত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে) । আমি কি করবো ? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হ'য়ে যাই ! নিজে কি করি, কিছুই জানতে পারি না ।

ডাক্তার । সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'রলে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তখন কি আমি কিছু করতে পারি ?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর ? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার Science মায়েন্স সব ছাই প'ড়েছে !

ডাক্তার । মহাশয় ! যদি টং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি ? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা ধরে থাকি ।

['ন যোংস্তে'—ভগবদ্গীতা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সেজো বাবুকে ব'লেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মান্ছো ব'লে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম ? তা তুমি মানো আর নাই মানো ! তবে একটা কথা আছে—মানুষ কি ক'রবে, তিনিই মানাবেন ! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো !

ডাক্তার । তুমি কি মনে ক'রেছ অমুক তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো ? * * * * * তবে তোমার সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি মানতে বলছি গা ?

গিরীশ ঘোষ । উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন ?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । তুমি কি বলছো ? ঈশ্বরের ইচ্ছা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে আর কি ব'লছি ! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি ক'রবে ? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব'ল্লেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কৰ্ম নয় । শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্লেন, অর্জুন ! তোমায় যুদ্ধ কর্তেই হবে ; তোমার স্বভাবে করাবে ! শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে র'য়েছে !*

“শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল ;—তাদের মতে অশ্বখগাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটা পাতাও নড়বার ঘো নাই !

[Liberty or Necessity ; Free will or God's will ?]

ডাক্তার । যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন ? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি বলাচ্ছেন, তাই বলি । আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী ।

ডাক্তার । যন্ত্র তো বলছো ; হয় তাই বল, নয় চুপ ক'রে থাকো, সবই ঈশ্বর ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । মশাই যা মনে করুন । কিন্তু তিনি করান্ তাই করি—a single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে ?

[Influence of Motives.]

ডাক্তার । Free Will তিনি দিয়াছেন তো । আমি মনে ক'রলে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি ।

গিরীশ । আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সংকাজ ভাল লাগে ব'লে করেন । আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায় ।

ডাক্তার । কেন, আমি কর্তব্য কৰ্ম্ম ব'লে করি—

গিরীশ । সেও কর্তব্য কৰ্ম্ম করতে ভাল লাগে ব'লে ।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি) । মনে কর, একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে ; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে—

গিরীশ । ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান ; আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায় । চাটের লোভে গুলি খাওয়া । (সকলের হাস্য ।)

['জ্ঞানং জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।']

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৰ্ম্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয় । মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই । ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে । খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে । তার পর ঘড়ার কানা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে । এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে । আমি নিজে ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি,—সাধু গাঁজা তয়ের ক'রছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ ।

ডাক্তার । কিন্তু আগুন 'heat'ও (উত্তাপও) দেয়, আর lightও (আলো ও) দেয় । আলোতে দেখা যায়, বটে ; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায় । Duty (কর্তব্য কৰ্ম্ম) ক'রতে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয় কষ্টও আছে ।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি) । পেটে খেলে পিঠে সয় । কষ্টতেও আনন্দ ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । Duty (কর্তব্য কৰ্ম্ম) শুষ্ক ।

ডাক্তার । কেন ?

গিরীশ । তবে সরস । (সকলের হাস্য) ।

মাষ্টার । বেশ dilemma, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়লো ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । সরস ; নচেৎ duty কেন করেন ?

ডাক্তার । এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি) ।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি) । ‘পোড়া স্বভাবে টানে’ । (হাস্য) । যদি এক দিকে ঝাঁক (inclination)ই হ’লো, তবে free will কোথায় ?

ডাক্তার । আমি free (স্বাধীন) একবারে বলছি না । গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে দড়ি যত দূর যায়, তার ভিতর free । দড়ি টান পড়লে আবার—
[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will.]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই উপমা যত্ন মল্লিকও ব’লেছিল । (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে ?

(ডাক্তারের প্রতি) । দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র । এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবমুক্ত—‘তোমার কৰ্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি ।’ কি রকম জানো ? বেদান্তের একটা উপমা আছে ।— একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো ; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান ক’রছে ‘আমি ন’ড়ছি,’ ‘আমি লাফাচ্ছি’ । ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীযন্ত, তাই লাফাচ্ছে ! যাদের জ্ঞান য’য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীযন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্ছে না, হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে । যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না । জীবের ‘আমি কর্তা,’ এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয় । ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান ; জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চূপ ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প’ড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা ।

“যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল থাকবে ; ততক্ষণ আমি সং কাজ করেছি, আমি অসং কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে । এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্ত বন্দোবস্ত । বিত্তা মায়া আশ্রয় করলে, সংপথ ধরলে তাঁকে লাভ করা যায় । তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হ’য়ে যেতে পারে । তিনি একমাত্র কর্তা—আমি অকর্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবমুক্ত । একথা কেশব সেনকে ব’লেছিলাম ।”

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । Free Will কেমন ক’রে আপনি জানলেন ?

ডাক্তার । Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it !

গিরীশ । Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি,—যে আমরা পরতন্ত্র) । (সকলের হাস্ত)

ডাক্তার । Dutyর ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty ব'লে কর্তব্য কর্ম করতে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয় । কিন্তু initial stageএ গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না । ছেলেবেলা দেখতুম পুরুত সন্দেহে পিপড়ে হ'লে বড় ভাবিত হ'তো । পুরুতের প্রথমেই সন্দেহ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—(হাস্ত) প্রথমে বড় ভাবনা ।

মাষ্টার (স্বগতঃ) । পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে ক'রে আনন্দ হয়; বলা বড় কঠিন । আনন্দের জোরে কার্য হ'লে free will কোথায় থাকে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[অহৈতুকী ভক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ইনি (ডাক্তার) যা ব'লেছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি । 'মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে' এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি । একটু আনন্দ হয় তা কি ক'রবো ?

“অহল্যা ব'লেছিলেন, হে রাম ! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না ।”

“নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলেন । তিনি সীতারাম দর্শন ক'রে স্তব ক'রতে লাগলেন । রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্লেন, 'নারদ ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তুমি কিছু বর লও ।' নারদ ব'ল্লেন 'রাম ! যদি একান্ত আমার বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো, যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই ।' রাম ব'ল্লেন, 'আরও কিছু বর লও ।' নারদ বল্লেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে 'শুদ্ধাভক্তি' ।

“এঁর তাই । যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহসুখ—কিছুই চায় না । এর নাম 'শুদ্ধাভক্তি' ।”

“আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয় । ভক্তির, প্রেমের

আনন্দ । শম্ভু (মল্লিক) ব'লেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—‘তুমি এখানে এস ; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক’রে আনন্দ পাও ‘তাই এস’ ;—ঐ টুকু আনন্দ আছে ।

“তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে ! বালকের মত যাচ্ছে ; কেন,—ঠিক নাই ; হয় তো একটা ফড়িঙ ধ’রছে ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বাছো ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাষে মতি না হয় !

“আমারও ঐ অবস্থা ছিল । একে দাস্ত্র বলে । আমি মা মা ব’লে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো । আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার জন্ত, আর আমার ‘পাগলামি’ সারাবার জন্ত তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর, চোক ভাল । আমি মা মা ব’লে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে ব’ল্লুম, ‘দাদা, দেখবে এসো, ঘরে কে এসেছে !’ হলধারীকে আর সব লোককে ব’লে দিলুম । এই অবস্থায় মা মা ব’লে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে ব’লতুম, ‘মা ! রক্ষা কর ; মা ! আমায় নিখাদ কর, মা ; যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায় । (ডাক্তারের প্রতি) তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব ।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব । নিষ্কামকর্ম ও কর্মত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না । কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায় । কামনাশূন্য হ’য়ে কর্ম ক’রতে চেষ্টা ক’রলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয় । রজোমিশ্রিত সত্ত্ব গুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক’রবো এই সব অভিমান এসে জোটে । জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করিতে যাওয়া বড় কঠিন । তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্ত কামনাশূন্য হ’য়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই ;—একে নিষ্কাম কর্ম বলে । এরূপ কর্ম করিতে চেষ্টা করা খুব ভাল ! কিন্তু সকলে পারে না ! বড় কঠিন ।

“সকলেরই কর্ম ক’রতে হবে ; দু একটা লোক কর্ম ত্যাগ ক’রতে পারে । দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায় । এই নিষ্কাম কর্ম ক’রতে ক’রতে রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ’য়ে দাঁড়ায় । শুদ্ধসত্ত্ব হ’লেই ঈশ্বর লাভ হয় ।

“সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না ; হেম আমায় ব’লেছিল ‘কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! জগতে মান লাভ করা মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, কেমন ?’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

অষ্টাদশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরীশ ঘোষ,
ডাক্তার সরকার প্রভৃতির কথোপকথন ও আনন্দ ।

27th October, 1885.

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ভজনানন্দে—সমাধিমন্দিরে ।]

পরদিন ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ । মঙ্গলবার বেলা সাড়ে পাঁচটা ।

আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্রামবসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট
নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন ।

ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ।

ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর
বলিলেন, ‘তবে শ্রামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি ।’ শ্রীরামকৃষ্ণ ও
এক জন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, ‘গান শুনবেন ?’

ডাক্তার । তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ !—ভাব চেপে রাখতে হবে !

ডাক্তার আবার বসিলেন । তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন ।
তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল । তিনি গাহিতে লাগিলেন,
গীত ।

চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,

শোভার আগার বিশ্ব-সংসার ।

অমৃত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,

কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার ।

শোভে বহুধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার ;

হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অদিবার ।

গীত ।

নিবিড় আঁধারে যা তোর চমকে অরূপরশি ।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হ’য়ে গিরিগুহাবাসী ।

অনন্ত অঁধারকোলে, মহা নির্ঝাণহিল্লোলে,
চিরশান্তিপরিমল, অবিরল যায় ভাসি ।
মহাকাল রূপ ধরি, অঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি ;
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজ্বলী জলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অটু অটু হাসি ।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him ! (এ গান
ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটতে পারে) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্ছে ? তিনি উত্তর করিলেন,
'ডাক্তার ভয় ক'রছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয় ।'

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন ; ডাক্তারের মুখপানে
তাকাইয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "না, না, কেন ভাব হবে ?" কিন্তু এ কথা
বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন । শরীর স্পন্দহীন,
নয়ন স্থির ! অবাক-কাষ্ঠপুতলিকার তায় উপবিষ্ট ! বাহশূন্য ! মন বুদ্ধি অহঙ্কার
চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ । আর সে মানুষ নয় ! নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে মধুর গান
চলিতে লাগিল । তিনি আবার গাহিলেন—

গীত ।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ !

আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি—

বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার ?

হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব ; যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ :

গীত ।

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,

যদি চরণ-সরোজে, পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে ।

অগণন ধনরাশি তায় কিবা কলোদয় হে,

যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে ।

সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে ।

যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে ।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি অঁধারময় হে,

যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাহি হয় উদয় হে ।

সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
 যদি সে প্রেমকনকে, তবে প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
 তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
 যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
 কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
 তুমি আমার হৃদয়রতন মণি আনন্দনিলয় হে।

“সতীর পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ-
 লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা! নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—
 গীত।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বোল্বে হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার!
 কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের-বৃন্দাবন,
 সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঙ্গনে যাবে লোচন আধার।
 কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
 হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
 (হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
 কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।
 মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
 পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমমুনার।
 প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
 আপনি মারিত্যে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে।]

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাহুসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন! গান সমাপ্ত
 হইল। তখন পণ্ডিত ও মুখের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর
 সাধারণের—সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাভুক্ত লোক নিস্তব্ধ
 সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়

মুখ এখনও যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ,—যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম ক’রবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়!” ‘আমি এত বড় লোক, আমি ‘হরি হরি’ বলে নাচব? বড় বড় লোক এ কথা শুনলে আমায় কি ব’লবে! যদি বলে, ‘ওহে; ডাক্তারটা ‘হরি হরি বলে নেচেছে! লজ্জার কথা!’ এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ও দিক দিয়েই যাওয়া নাই; লোকে কি ব’লবে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য।)

[বিজ্ঞান কিরূপে হয়—ব্রহ্মদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলার পর দুই কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞানকাঁটা আনিতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুইটাই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষণ ব’লেছিলেন, রাম! এ কি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ’য়ে কঁদেছিলেন! রাম ব’লেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম তিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন—

আম্ন মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্লতকমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি। ১১৯ পৃষ্ঠা।

[অবাঙ্ মনসোগোচরম্; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না।]

শ্রামবহু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্। তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো?

কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি ক’রে বুঝাবে?

হৃদ বলতে পার, ‘কেমন ঘী, না যেমন ঘী ।’ একটা মেয়েকে তার একটা সঙ্গী জিজ্ঞাসা ক’রেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয় ? মেয়েটা ব’লে, “ভাই, তোর স্বামী হ’লে তুই জানুবি ; এখন তোরে কেমন ক’রে বুঝাব ।’ পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন । গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বল্লেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয় । তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর ।

“ব্রহ্ম কি জিনিষ—মুখে বলা যায় না । একজন ব’লেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হ’য়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই । এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই । তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই ! আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না ! যার হয়েছে, সে জানে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[পণ্ডিত ও অহঙ্কার ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখ অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না । ‘মুক্ত হ’ব কবে আমি যাবে যবে ।’ ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই দুইটা অজ্ঞান । ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ এই দুইটা জ্ঞান । ঠিক ভক্ত, সে বলে,—হে ঈশ্বর ! তুমিই কর্তা, তুমিই সব কোরছো । তুমিই কেবল যত্ন । আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি । আর এসব তেমন ভয়, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ । তোমার গৃহ পরিজন, আমার কি ? আমি দাস । তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার ।

“যারা একটু রৈ টে পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জেঁকে উঠে । ক—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল । সে বলে, ‘ও সব আমি জানি । আমি ব’লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি, দিল্লী গিয়ে আর জাঁক করে ?’ যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু !

শ্যামবসু । তিনি (ক-ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওগো ব'ল্‌বো কি ! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটা মেথরাণীর যে অহঙ্কার ! তার গায়ে দু এক খানা গহনা ছিল । সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু এক জন লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল । মেথরাণী তাদের ব'লে উঠলো, 'এই ! সরে যা ।' তা অগ্র লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি ব'ল্‌বো !'

[পাপ পুণ্য ।]

শ্যামবসু । মহাশয় ! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রছেন, এ কি রকম কথা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি !

নরেন্দ্র । সোণার বেণে বুদ্ধি, অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে ! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি ? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা ! (শ্যামবসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্ত মানবজন্ম পেয়েছ । ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর । তোমার এত শত কাজ কি ? ফিলজফী (Philosophy) লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে ? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার । গুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার ?

ডাক্তার । আর ঈশ্বরের মদ infinite ! সে মদের শেষ নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি) । আর ঈশ্বরকে আশ্রোক্তারী দাও না । তাঁর উপর সব ভার দাও । সং লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অগ্রায় করেন ? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন !

ডাক্তার । তাঁর মনে কি আছে, তিনি জানেন । মানুষ হিসাব ক'রে কি ব'ল্‌বে ? তিনি হিসাবের পার !

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি) । তোমাদের ঐ এক কল্কাতার লোক-গুলো ব'ল, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ !' কেন না, তিনি এক জনকে স্থখে রেখেছেন, আর এক জনকে দুঃখে রেখেছেন । শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে !

['লোকমাগ' কি জীবনের উদ্দেশ্য ?]

“হেম দক্ষিণেশ্বর যেত । দেখা হ'লেই আমায় ব'লতো, কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই ! জগতে এক বস্তু আছে ;—মান্ ?” ঈশ্বরলাভ যে মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[সূক্ষ্মশরীর ।]

শ্যামবহু । সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে ? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চ'লে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় প'ড়েছে তোমায় দেখাতে ! কোন্ শালা মান্বে আর না মান্বে, তাদের দায়টী ! একটা বড় লোক হাতে থাকবে এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না ।

শ্যামবহু । আচ্ছা, স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি ?

[স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ! পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটী স্থূল দেহ । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিন্তা, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর । যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সন্তোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর । তজ্জ্ঞে বলে, ভাগবতী তনু । সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না ।

[সাধনের প্রয়োজন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেবল শুন্লে কি হবে ? কিছু করো !

“সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে ব'লে কি হবে ? তাতে কি নেশা হয় ?

সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখ'লেও নেশা হয় না ! কিছু খেতে হয় । কোন্টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা কোন্টা চল্লিশ নম্বরের,—সূতার ব্যবসা না ক'রুলে এসব কি বলা যায় ? যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নাই । তাই বলি, কিছু সাধন কর । তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ মহাকারণ কা'কে বলে, সব বুঝতে পারবে ।

[ঈশ্বরে একমাত্র ভক্তিই সার ।]

“যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা ক'রবে ।

শ্রামপুকুর বাটী । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৭২

“অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ব’ল্লেন, তুমি আমার কাছে বর লও ।’ অহল্যা ব’ল্লেন, ‘রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু হে রাম ! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে !’

“আমি মার কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম । মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় ক’রে ব’লেছিলাম, মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ।’

“ধর্ম কিনা দানাদি কর্ম । ধর্ম নিলেই অধর্ম ল’তে হবে । পুণ্য নিলেই পাপ ল’তে হবে । জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল’তে হবে । শুচি নিলেই অশুচি ল’তে হবে । যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে । যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে । যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে ।

“যদি কারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য ; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার । তবে সে অধম ! এখানে একটা কথা বলি ;—বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল । শূকরমাংস খাওয়া আর Colic (পেটে শূলবেদনা) ও হওয়া ! এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিও) খেতো । নির্ঝাণ টিক্কাণ কি জ্ঞান, আফিঃ খেয়ে বুঁদ হ’য়ে থাকতো, বাহুজ্ঞান থাকতো না ;—তাই নির্ঝাণ !’

বুদ্ধদেবের নির্ঝাণ সম্বন্ধে এই ব্যথ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন ; আবার কথাবার্তা চলিতে লাগিল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রামবস্ত্র প্রতী) । সংসার ধর্ম ; তাতে দোষ নাই । কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজ কর্ম ক'রবে । এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়ত কাজ কর্মও করে, কিন্তু তার মন যেমন ফোড়ার দিকে প'ড়ে থাকে সেইরূপ ।

“সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাকবে । মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে ।”

(ডাক্তারের প্রতী) বুঝেছ ?

ডাক্তার । ও ভাব যদি না থাকে, বুঝব কেমন ক'রে ?

শ্রামবস্ত্র । কিছু বোঝো বই কি ! (সকলের হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধ'রে ক'রছেন ! কি বল ? (সকলের হাস্য ।)

[থিয়সফি Theosophy.]

শ্রামবস্ত্র । মহাশয় ! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মোট কথা এই, যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তারা হাল্কা থাকের লোক । আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্কা থাক । যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি । অগ্নি আর এক-দেশে এক জন কি কথা বলছে তাই বলতে পারা, এই এক শক্তি । ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারি কঠিন ।

শ্রামবস্ত্র । কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম পুনঃ স্থাপিত করবার চেষ্টা করছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না ।

শ্রামবস্ত্র । মরুবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হবে । আমার ভাব কি রকম জান ? হুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি ? হুমান বলে, ‘আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না ; কেবল এক রাম চিন্তা করি !’ আমার ঠিক ঐ ভাব ?

শ্রামবস্ত্র । তারা বলে, ‘মহাত্মা’ সব আছেন । আপনার কি বিশ্বাস ?

শ্যামপুকুর বাটী। সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ২৮১

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অস্থখটা ক'ম্লে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। দেখ্ছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমাকে এই বলা; রাগ কোরো না; ও সবতো অনেক ক'ম্লে—টাকা, মান, Lecture;—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও; আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে। ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে।

কিয়ংকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোথান করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ ধুলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাকতে উনি (গিরীশ বাবু) আসবেন না! যাই চ'লে যাব যাব হ'য়েছি, অমনি এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য।)

গিরীশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞান সভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আমায় এক দিন সেখানে (Science Associationএ) লয়ে যাবে?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[গুরুপূজা।]

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। আর সব কর—but do not worship him as God (ঈশ্বর ব'লে পূজা কোরো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ!

গিরীশ। কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার ক'রলেন তাঁকে আর কি করবো বলুন। তাঁর শু কি শু বোধ হয়?

ডাক্তার । গুর জন্ম হ'চ্ছে না । আমারও ঘৃণা নাই ! একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহে ক'রে ফেল্লে ! সকলে নাকে কাপড় দিলে ! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে ! নাকে কাপড় দিই নাই । আর মেথর যতক্ষণ মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই । আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা করব ? আমি কি এ'র পায়ের ধূলা নিতে পারি না ?—এই দেখ নিচ্ছি ! (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ) ।

গিরীশ । Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্য ধন্য করছেন ।

ডাক্তার । তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য ! আমি যে সকলেরই নিতে পারি ।—এই দাও ! এই দাও ! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ) ।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) । এ'কে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি । কি রকম জানেন ? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ) ও Animal Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা (point) স্থান আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন । সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর ।

ডাক্তার । ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না ।

নরেন্দ্র । আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) বলছি ।

ডাক্তার । ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয় । প্রকাশ করা ভাল নয় । আমার ভাব কেউ বুঝলে না ! My best friend (যারা আমার পরম বন্ধু,) আমাকে কঠোর নিদর্শন মনে করে ! এই তোমরা হয়ত আমায় জুতো মেরে তাড়াবে !

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । সে কি !—এরা তোমায় কত ভালবাসে তুমি আসবে বলে বাসরসজ্জা করে জেগে থাকে ।

গিরীশ । Every one has the greatest respect for you. (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে ।)

ডাক্তার । আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতাহীন),—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারও কাছে প্রকাশ করি না ।

গিরীশ । তবে মহাশয় ! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at

শ্যামপুকুর বাটি । সরকার, নরেন্দ্র, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৮৩

least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্ততঃ কৃপা করে) ;—এই মনে ক'রে যে, তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না !

ডাক্তার । বল্‌বো কি হে ! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়) ।

(নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude ! (আমি একলা একলা বসে কাঁদি !)

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপগ্রহণ]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । ভাল, তুমি ভাব হ'লে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি জানতে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না !

ডাক্তার । ওটা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি বল্‌বো ? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্ত ! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয় । উন্মাদে এরূপ হয়, কি কোরবো ?

ডাক্তার (ভক্তগণের প্রতি) । ইনি মেনেছেন । He expresses regret for what he does ; কাজটা sinful (অশ্রায়) এটা বোধ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান) । তুই বল না ; একে বুঝিয়ে দেনা !

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । মহাশয় ! আপনি ভুল বুঝেছেন । উনি সে জন্ত দুঃখিত হননি । এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ । ইনি জীবের মঙ্গলের জন্ত তাদের স্পর্শ করেন । তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখন কখনও ভাবেন । আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হ'য়েছিল তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়তুম ? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অশ্রায় কাজ ? রোগের জন্ত regret (দুঃখ কষ্ট) হ'তে পারে তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত স্পর্শ করাকে অশ্রায় কাজ মনে করেন না !

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া গিরীশের প্রতি) । তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও (গিরীশের পদধূলিগ্রহণ) । (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে ।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) । আর এক কথা দেখুন । একটা Scientific

discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্ত আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন—শরীর অস্থখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান) এর জন্ত ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না ?

[অবতারাди ও নরেন্দ্র ।]

ডাক্তার । যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছে, jesus (যীশু), Chaitanya (চৈতন্য), Buddha (বুদ্ধ), Mohammed (মহম্মদ) শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ;—বলে আমি যা বলুম, তাই ঠিক' ! এ কি কথা !

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি) । মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হচ্ছে ! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে ।

ডাক্তার নীরব হইলেন ।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি ।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের গায় হাসিতেছেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—পরিশিষ্ট ।

বরাহনগর মঠ ।

আজ সোমবার ২ই মে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ । জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণ-দ্বিতীয়া তিথি ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা মঠে আছেন । শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন । নিরঞ্জন মাকে দেখিতে গিয়াছেন । মাষ্টার আসিয়াছেন ।

খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন । গোপাল (ঠাকুর তাঁহাকে ‘বুড় গোপাল’ বলিতেন) গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন ।

বৈকাল হইল । রবীন্দ্র উন্মত্তের গায় আসিয়া উপস্থিত । শুধু পা ; কালা পেড়ে কাপড় আধখানা পরা । উন্মাদের চক্ষের গায় তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতেছে । সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে ? রবীন্দ্র বলিলেন, একটু পরে সমস্ত বলিতেছি । আমি আর বাড়ী ফিরিয়া যাইব না ; আপনাদের এখানেই থাকিব । সে বিশ্বাসঘাতক ! বলেন কি মশায়, পাঁচ বছরের অভ্যাস মদ—তার জন্ত ছেড়েছি ! আট মাস হলো ছেড়েছি ! সে কি না বিশ্বাসঘাতক !

মঠের ভাইরা সকলে বলিলেন, “তুমি ঠাণ্ডা হও । কিসে ক’রে এলে ?” রবীন্দ্র বলিলেন, “আমি কলিকাতা থেকে বরাবর শুধু পায়ে হেঁটে এসেছি ।”

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আর আধখানা কাপড় কোথা গেল ?” রবীন্দ্র বলিলেন, সে আসবার সময় টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল । ভক্তেরা বলিলেন, তুমি গঙ্গা স্নান ক’রে এসো, এসে ঠাণ্ডা হও । তার পর কথাবার্তা হবে ।”

রবীন্দ্র কলিকাতার একটা অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বয়ঃক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে দর্শন করিয়াছিলেন । এবং তাঁহার বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন । একবার তিন রাত্রি তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন । স্বভাব অতি মধুর ও কোমল । ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, ‘তোমার কিন্তু দেবী হবে, এখন তোমার একটু ভোগ আছে । এখন কিছু হবে না । যখন ডাকাত পড়ে, তখন ঠিক সেই সময় পুলিশে কিছু করতে পারে না । একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে ।’

আজ রবীন্দ্র বারানসীর মোহে পড়িয়াছেন । কিন্তু অণু সকল গুণ আছে । গরীবের প্রতি দয়া, ঈশ্বর চিন্তা, এ সমস্ত আছে । বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অর্দ্ধবস্ত্রে মঠে আসিয়াছেন । সংসারে আর ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প ।

রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাইতেছেন। পরামণিকের ঘাটে যাইবেন। একটি ভক্ত বন্ধু সাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ছেলেটির লাধুসকে চৈতন্য হয়। জানের পর তিনি রবীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে মৃতদেহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, “এখানে মঠের ভাইরা মাঝে মাঝে একাকী এসে রাত্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান করা ভাল। সংসার যে অনিত্য, তা বেশ বোধ হয়।”

রবীন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান বেশীক্ষণ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রের মন অস্থির রহিয়াছে।

উভয়ে মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরঘরে আসিয়া উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ভক্তটী বলিলেন,—এই ঠাকুরঘরে মঠের ভাইরা ধ্যান করেন। রবীন্দ্রও একটু ধ্যান করিতে বসিলেন। কিন্তু ধ্যান বেশীক্ষণ হইল না।

মণি (রবীন্দ্রের প্রতি)। কি, মন কি বড় চঞ্চল? তাই বুঝি উঠে পড়লে? তাই বুঝি ধ্যান ভাল হ’ল না।

রবীন্দ্র। আর যে সংসারে ফিরিব না তা নিশ্চিত। তবে মনটা চঞ্চল বটে।

মণি ও রবীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি বুদ্ধদেবের গান করিতেছেন। দেবকন্যাদের একটা গান শুনে বুদ্ধদেবের প্রথমে কৈতর হয়েছিল। আজকাল মঠে বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিতের আলোচনা সর্বদাই হয়। মণি সেই গান গাইতেছেন।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই

কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,

ফিরে ফিরে আসি কত কাদি হাসি,

কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই। (ইত্যাদি)

মঠের নরেন্দ্র, তারক ও হরীশ—কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। আসিয়া বলিলেন, উঃ, খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কলিকাতায় কোন ভক্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

নরেন্দ্র ও মঠের ভাইরা কানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। মাষ্টার রবীন্দ্র ইত্যাদি এঁরাও বসিয়া আছেন।

নরেন্দ্র মঠে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

[সন্তোষজীব ও নরেন্দ্রের উপদেশ ।]

নরেন্দ্র এইবার গান গাইতেছেন। গীতকালে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন।



শ্রীযুক্ত জ্যোত্স্নাচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।



শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ।



শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ।



ড. সৈয়দ, মহিমাচরণ, গঙ্গাধর, হরিশ, বুড়োগোপাল, শশী। বিনোদ, মাষ্টার, কালী, নবগোপাল, ভূপতি। মণিমাছিক, ফকির, মুরেলী। জতুল, তারক, ছোটগোপাল বৈবুঠ, বাবুরাম,

ডুব, ডুব, ডুব, রূপসাগরে আমার মন।

ছই এক পদ গাইতে গাইতেই, ডুব, ডুব, ডুব, বলতে বলতে ডুব!

সমাধি ভঙ্গ হলো, পাইচারি করতে লাগিলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা ছই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এ দিক দিয়ে খানিকটে মেঝে ঝাঁটিয়ে যাচ্ছে, ও দিক দিয়ে খানিকটে অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপাটিপি করছি আর চুপি চুপি বলছি ‘ধুতিটি পরা হ’য়েছে ভালো।’ একটু পরেই ছবু শালার ধুতি ব’লে ধুতিটে ফেলে দিলেন। দিগন্ত হ’য়ে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তর দিক থেকে কার যেন ছা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন—“এ ছাতা লাঠি তোমাদের?” আমি বললাম “না”। অমনি বললেন “আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই এক লোক হাউ মাউ ক’রে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।”

কিছুকাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হ’য়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—“ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছ?”

আমি বললাম, না আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?”

ঠাকুর। আরে শিবনাথ টিবনাথ অসভ্য মনে করে না। ওরা এতে কোন রকমে একটা ধুতি টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরীশ ঘোষকে চেনো?

আমি। কোন গিরীশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর। হ্যাঁ।

আমি। দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর। ভাল লোক।

আমি। শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর। থাক্ না, থাক্ না, ক’ দিন খাবে?

নরেন্দ্রের বিষয় বললেন :—“তুমি নরেন্দ্রকে চেনো?”

আমি। আজ্ঞা না।

ঠাকুর। আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়। সে এ, পাশ দিয়েছে বিয়ে করেনি।

আমি। যে আজ্ঞা, আলাপ করবো।

ঠাকুর। আজ রাম দত্তের বাড়ী কীর্তন হবে। সেইখানে দেখা হবে সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।

আমি। যে আজ্ঞা।

ঠাকুর। যাবে ত? যেও কিন্তু।

আমি। আপনার হুকুম হ'লো, তা মানবো না? অবিশিষ্ট যাবো।

ঠাকুর। আচ্ছা, যেও।

ঘরে ছবি কথানা দেখালেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন “বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়?”

আমি। শুনতে পাই পাওয়া যায়।

ঠাকুর। সেই ছবি একখানি তুমি আমার দিও।

আমি। যে আজ্ঞা, যখন ফের আসবো, নিয়ে আসবো।

আর দেখা হ'লোনা! আর সে শ্রীচরণপ্রাপ্তে বস্তুতে ভাগ্যে ঘটে নাই।

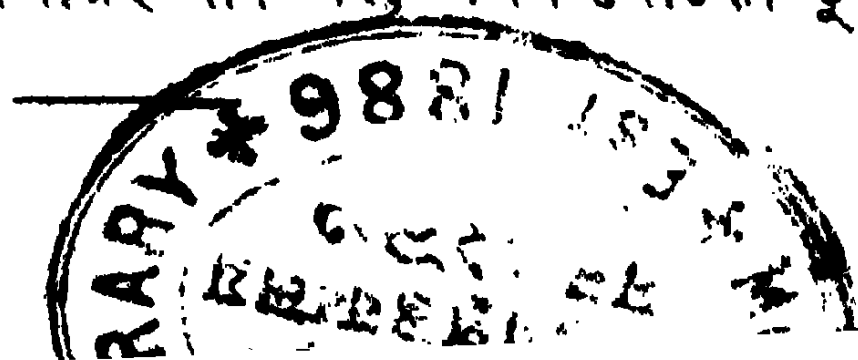
সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ী গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'ল! ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডান পাশে। আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বল্লেন।

নরেন্দ্র বল্লেন “আজ আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না।” আমি বল্লাম “থাক, আর একদিন আলাপ হবে।”

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনের মে কি জুন মাসে আলমোড়ায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা ত পূর্ণ হতেই হবে, তাই বারো বছর পরে পূর্ণ হল। হাহা! সেই স্বামীবিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম! কখনও তাঁর বাড়ীতে কখনও আমার বাড়ীতে, আর একদিন নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সেবারের দেখা।

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হ'য়েছিল যে তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হ'ত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, এমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি, সম্মুখের থেকে সরে এলেই মনে হ'ত ‘ওরে অপারে! কার কাছে গেছলাম!’ ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন ধুময় করে রেখেছে। সেই যে দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃস্বলের অফুরন্ত সঞ্চল গো। আর সেই হাসিচ্যুত মৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে ভেবে “হুয়ামি চ মুহমুঃ, হুয়ামি চ পুনঃ পুনঃ।” আমারই যদি এই, এখন বোঝো তুমি কেমন ভাগ্যধর।”



OPINIONS.

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 1909 says:—** “If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. ** You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days.”

Swami Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Math, then of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct. 1904, says: - ** “You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God.”

In a letter dated Mylapur, Madras, 10th April, 1909, he also says:—“I went through the graphic description (in Sri Sri Ramkrishna Kathamrita Part III) of Sri Guru Maharaja’s going to bless Pandit Iswar Chandra Vidyasagore. It is unparalleled. The picture is so very vivid that it is perfectly life-like. You have been able to baffle the all-destructive power of time. We see Sri Guru Maharaj again with the Bhaktas engaged in saving miserable men and women from the hands of Ignorance and Death. God preserve your life for a long time to come so that you may successfully wage war against All-destroying Time and keep Sri Ramkrishna ever living in this world of miseries so that his Divine presence may serve to dispel the gloom from many minds. * *

Swami Premananda (Baburam) of Belur Math, in a letter dated Puri. 21st July, 1906, says:—“শ্রীশ্রীকথামৃত ঘরের কথা বলে এত দিন বড় মন দিই নাই। কিন্তু এখন আর হাত ছাড়া কর্তে পাচ্ছি না। কত কথাই মনে হচ্ছে। ধন্য আপনি।” In his letter dated, Belur Math, 19th April, 1909, he says:—**“কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোকে প্রাণ পাচ্ছে, সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে, কত শত লোক সংসারের তাপে তাপিত হয়ে শান্তি পাচ্ছে। * * সত্যকথা, দেখেছি কতলোকে শান্তি পাচ্ছে,—এই শোক মোহের সংসারে।”

Swami Abhedananda Belur Math, now at New York, says:—I think your Bengali edition of Sri Sri Ramkrishna Kathamrita is perfect.

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation, 19th May 1902 says—

Ramkrishna Kathamrita by M. Part I. is a work of singular value and interest. * He has done a kind of work which no Bengali had ever done before, which, so far as we are aware, no native of India had ever done. It has been done only once in history, namely by Boswell. * But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kind-hearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. What is the wit or even the worldly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine Devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves—for the character of the teacher and the teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would have been to the world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, Mahomet, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved !

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বঙ্গভাষায় এক অমূল্য জিনিষ।
‘ম’ ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও ভাণ্ডারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই
গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইবে। নব্যভারত ১৩০৮ চৈত্র।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বস্তুতই অমৃতের নিধি। সঞ্জীবনী, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৯।

প্রকাশক, শ্রীপ্রভাশচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতা, ১৩১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি।

PRINTED BY K. C. GHOSH.

AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS

64-1 & 64-2, SUKEA'S STREET, CALCUTTA.

